॥ সূচীপত্র

সংশোধন

পৃঃ	লাইন	আছে	হবে
১২২	১২	শড়বো / দুলিয়া	গড়বো / দুনিয়া
—	১৬	হাটে মাঠে রে	হাটে মাঠে তুলবোরে
—	২৮	অনুষ্টিত	অনুষ্ঠিত
১২৩	৯ (শেষে)	॥	।।
—	নিচে থেকে ২ (শেষে) ।।		।।।।
—	২৩ / ২৯	না	ণা

১২৩ পৃষ্ঠা—শেষ স্তবকটির সুর আগের স্তবকের মত হবে।

নিবেদন

লোকসঙ্গীতের গবেষক হিসাবে ক্ষেত্র গবেষণা করতে গিয়ে বুঝেছি যে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের বাংলা গানের সামগ্রিক রূপসম্পর্কে ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। কারণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞেরা বিস্তারিত ও ব্যাপক আলোচনা পুস্তক-পুস্তিকা পত্র-পত্রিকার মারফত উপস্থাপিত করেছেন। সেই তুলনায় বাংলা গান নিয়ে আলোচনা খুবই সীমিত। তাই বাংলা গানের সাঙ্গীতিক আলোচনায় আমি ব্রতী হয়েছি, এটা শিক্ষক হিসাবে আমার একটা কর্তব্য বলে মনে করেছি।

বাংলা গানের আদি যুগ শুরু হয় খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে এবং তার বিস্তৃতি ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। আর মধ্যযুগ হ'ল ত্রয়োদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। তার পর থেকে আধুনিক যুগের সূচনা। এই তিনটি যুগের যে সব সঙ্গীতজ্ঞ সুরকার ও গীতিকারেরা এসে বাংলা গানকে পুষ্ট করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের সাঙ্গীতিক অবদান সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। যতদূর সম্ভব হয় সময়ানুক্রমিক ধারাকে মানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ধারাকে পুরোপুরি মানা সম্ভব হয়নি আলোচনা প্রসঙ্গে।

চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত উদাহরণ স্বরূপ কিছু গানের সংকলন এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ক্রমানুসারে সেগুলি না থাকলেও প্রত্যেকটি গানের সময়কাল বলা আছে, এর সঙ্গে সুরের জন্য কিছু গানের স্বরলিপির সংযোজনও করা হয়েছে। প্রাচীন গানের উল্লিখিত সুর ও তাল নিয়ে স্বরলিপিগুলি করা আছে। প্রামাণিকতার জন্য নিধুবাবুর গানের স্বরলিপি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সঙ্গীতবিদ্ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের নিজ হাতে তৈরী করা কয়েকটি স্বরলিপির অনুলিপিও দেওয়া হয়েছে। তার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি লিখবার অনুপ্রেরণা ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সঙ্গীতজ্ঞ নারায়ণ চৌধুরী, সংগীতবিদ্ সুকুমার রায়, গ্রামোফোন কোম্পানীর এ্যাড্‌ভাইজার বিমান ঘোষ। এদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ থাক্‌লাম।

বইটি সংগীত রসিক ও শিক্ষার্থীদের কাজে লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রীবুদ্ধদেব রায়

অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কণ্ঠ সঙ্গীত বিভাগ, জোড়াসাঁকো।

ভূমিকা

নারায়ণ চৌধুরী

শ্রীবুদ্ধদেব রায় আজ চার দশক যাবৎ একাদিক্রমে বাংলা সংগীতের চর্চা করে আসছেন। তিনি তত্ত্ববেত্তা এবং প্রায়োগিক শিল্পী দুই-ই। লোকসংগীত তথা লোকসংস্কৃতি তাঁর অনুশীলনের মূলক্ষেত্র হলেও এই দুই বিভাগেই শুধু তিনি তাঁর তাবৎ মনোযোগ সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, লোকসংগীতের পাশে পাশে বাংলা গানের আরও যেসব বিশিষ্ট ধারা আছে, যেমন দ্বিজেন্দ্র-গীতি, নজরুল-গীতি, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গান—এগুলির সম্বন্ধেও তাঁর তত্ত্ব বিষয়ক বইয়ের ভিতর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও চর্চার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। তাঁর সংগীত অভিনিবেশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও একটি বলবার কথা এই যে, কী লোকসংগীত, কী অন্য ধারার বাংলা গান যে-বিষয়েই তিনি গ্রন্থরচনা করে থাকুন না কেন, সেগুলি নিছকই আলোচনার বই নয় কিংবা বিবিধ প্রকার গানের নমুনার সংগ্রহমাত্র নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনা ও নমুনা জোরদার করবার চেষ্টা করা হয়েছে বহুসংখ্যক স্বরলিপির সংযোজনার দ্বারা। অর্থাৎ তাঁর আলোচনা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া আলোচনা, গানের নমুনাগুলিও কেবলমাত্র গানের বাণীবিন্ধ রূপমাত্র নয়; একই সঙ্গে সেগুলি বাণীর সুরাশ্রিত রেখান্বিত রূপও বটে। বুদ্ধদেব রায়ের অধিকারের সীমার মধ্যে বাচ্যাক্ষর ও রেখাক্ষর এই দুইয়েরই যে এককালীন সমান স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, তার বেশীর ভাগ বইতেই এমনতর সাক্ষ্যের অসংশয় বিদ্যমানতা দেখতে পাই। এটা আর কিছু নয়, ঔপপত্তিক ও ব্যাবহারিক সংগীতের এই উভয়বিধ জগতেই তাঁর তুল্যরূপ অবলীলায়িত বিচরণ-শীলতার নিদর্শন।

'বাংলা গানের স্বরূপ' লেখকের এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশেষ প্রচারিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থেও প্রত্যাশিত রূপে লেখকের অভ্যস্ত ধারা অনুযায়ী আলোচনা, গানের নমুনা ও গানের স্বরলিপির একত্র সমাহার ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এই বইটির অভিনবত্ব এখানে যে, এতাবৎ বুদ্ধদেব রায় যতগুলি বই লিখেছেন তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই বাংলা গানের এক-একটি খণ্ড রূপের পরিচয় বিধৃত আছে কিন্তু এই তাঁর প্রথম বই যাতে তিনি বাংলা গানের আনুপূর্বিক ইতিহাস সংবলিত একটি সামগ্রিক রূপের পরিচয় পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করেছেন। বাংলা ভাষা ও বাংলা গানের উদ্ভবের কাল প্রায় সমসাময়িক বলা যায়। ওই নিরিখে অষ্টম-নবম শতকে পালরাজদের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে সেনরাজাদের আমলের মধ্য দিয়ে পাঠান অধিকারের পর্বকাল অতিক্রম করে, যেমন-যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ও বিকাশ হয়েছে, তার সঙ্গে তাল রেখে তেমন-তেমন বাংলা গানেরও সমানুপাতিক বিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পালরাজাদের আমলে ছিল লোকায়তিত গীতির প্রাধান্য। আর সেনরাজাদের আধিপত্যের সময়ে দেখা দেয় উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের প্রভাব। এই দুই কালের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে অর্থাৎ দশম-একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত দোহাগুলির প্রকাশ, যেগুলি "চর্যাপদ" নামে সচরাচর

অভিহিত। কিন্তু পালরাজাদের আমলের গানই হোক আর বৌদ্ধ সাধনপ্রণালীর নিগূঢ় সংকেতবাহী "সন্ধ্যাভাষা" নামক এক ইঙ্গিতাত্মক ভাষা লিপিতে রচিত চর্যাপদই হোক আর লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব অনবদ্য সংস্কৃত গীতিকাব্য ; "গীতগোবিন্দই" হোক, আর তৎপরবর্তী সময়ের রচনা বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই" হোক, এর সবকটি রচনার শিরোভাগেই কতকগুলি বিশেষ রাগ-রাগিনী উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যথা, বড়ারী, বঙ্গাল, মালব, গুর্জরী, গুণকিরি, কামোদ, গান্ধার, খাম্বাজ, পটমঞ্জরী ইত্যাদি। এর থেকে এই সুদৃঢ় অনুমান করা চলে যে, এগুলিই হলো বাংলাদেশে প্রচলিত রাগ-রাগিনী সমূহের আদি ও অকৃত্রিম রূপ। বাংলা গানের ওই প্রাচীন নিদর্শন সমূহের সুরের গঠন সম্বন্ধে আরও যেটা লক্ষণীয় তা হলো এই যে, ওই সব গান আসলে ছিল—কীর্তনেরই কোন-না কোন রূপভেদ মাত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বৌদ্ধ দোঁহাগুলি চর্যাপদ নামে অভিহিত হলেও সুরের গঠনের দিক্ দিয়ে আসলে সেগুলি কীর্তনই। সুর বৈশিষ্ট্যে চর্যাপদ আর কীর্তনের পদে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। চর্যাপদের কাল থেকে অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তি সীমা পর্যন্ত একটানা আটশো বছর কীর্তনই বাংলা গানের ভুবন অধিকার করে ছিল প্রায় অসপত্ন মহিমায়। ব্যতিক্রম শুধু পরিলক্ষিত হয় শাক্তপদাবলীর বেলায় এবং অল্পবিস্তর পরিমাণে মঙ্গলগীত, পাঁচালী, রামায়ণী গান প্রভৃতি মূলতঃ আখ্যায়িকা-গীতিগুলির বেলায়। যাত্রাপালার গানও কীর্তনের ধারা থেকে বিশ্লিষ্ট কমবেশী একটি স্বতন্ত্র ধারা। সেখানে রাগগীতির সমর্থক প্রাধান্য। কিন্তু এই সব ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় নিমগ্ন কীর্তনই যে বাঙালী জাতির সাংগীতিক কল্পনা ও প্রতিভাকে সবচেয়ে বেশী স্ফূর্তি দান করেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

কীর্তনকে যে বাংলার 'জাতীয় সংগীত' বলা হয় এই কারনেই বলা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কীর্তনকে বাংলার সবচেয়ে স্বাতন্ত্র জ্ঞাপক গান বলে অভিহিত করেছেন এবং "নাটকীয়তাকে" ওই গানের মৌলিক গোত্রলক্ষণের মর্যাদা দিয়েছেন।

সুবিজ্ঞ লেখক বাংলা গানের বিবিধ ধারা নিয়ে এই বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর এই বহুমুখী দিকদর্শন মূলক সমীক্ষায় বাংলা গানের একটা সার্বিক বিবরণ যেমন উপস্থাপিত তেমনি ওই গানের বিভিন্ন রূপভেদগুলিরও সুরগত প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যও অপ্রতিবাদ্য নৈপুণ্যে বিশ্লেষিত। ইংরেজ আগমনের পরবর্তী পরিবর্তিত পটভূমিতে ক্রিয়াশীল প্রধান-প্রধান বাংলা গানের ধারাগুলির (যথা, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি) অনুপুঙ্খ পরিচয় এই বইয়ের আর একটি মুখ্য আকর্ষণ। নজরুল উত্তর বাংলা গানের বিবরণেরও কিছু কমতি নেই। সেই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত লোকসংগীতগুলির বিষয়ে বিশেষজ্ঞোচিত আলোচনা তো আছেই। এটি লেখকের স্বক্ষেত্র। সুতরাং স্বতঃই আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে গভীর আত্মপ্রত্যয় সঞ্জাত হস্তামলকবৎ অধিকার-নৈপুণ্য।

মোটকথা, 'বাংলা গানের স্বরূপ' সংগীতসম্বন্ধীয় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই বই লেখককে নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিষ্ঠা দেবে নিঃসন্দেহে।

অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

সাহিত্য-সংস্কৃতির আদিযুগ বাংলায় শুরু হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার বিস্তৃতি ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। আর মধ্যযুগ বিস্তৃতি লাভ করে ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, আধুনিক যুগ শুরু হয় এর পর থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।

রাজা শশাঙ্কের পর বাংলায় পালবংশ ও সেনবংশ রাজত্ব করেন। এই রাজত্বকালে বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

পাল ও সেন যুগ

এই অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ। এ যুগেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। এর আগে বাঙালী সাহিত্য, সঙ্গীত যা সৃষ্টি করেছে তা সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায়। বাংলা ভাষা সৃষ্টি হবার পরই বাংলা সঙ্গীতের জন্ম এবং তখন থেকেই বাঙালীর সঙ্গীত সাধনা শুরু হয়। বাঙালীর এই সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমেই তার সাহিত্য চর্চা। অর্থাৎ চর্যাপদ বা চর্যাগীতির মাধ্যমেই বাঙালীর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।

একাদশ শতাব্দীর শেষে সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে রামাবতী নগরী। রামপাল এই নগরীর পত্তন করেছিলেন বলে ঐ নগরীর ঐরূপ নামকরণ হয়েছে। পশ্চিম ভারত থেকে সঙ্গীতের বহু উপকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন রাগ-রাগিণী বাংলার সংগীতে এসে প্রবেশ করে এবং রাগরাগিণীর মধ্যে মালব, গুর্জরী, খাম্বাজ-গান্ধার ইত্যাদি অন্যতম।

পাল রাজত্বের পর সেনবংশ বিশেষ করে বল্লালসেনের রাজত্বে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ঘটে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদেরা লক্ষ্মণ সেনের দরবারে যাতায়াত করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। আর লোকায়ত সঙ্গীত ছিল পাল রাজত্বে। সেন রাজত্ব থেকে শুরু হয় দরবারী সঙ্গীতের নানা ধরনের চর্চা। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বেণু, বীণা, মুরজ সহযোগে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্ছনায় রামাবতী নগরী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতো। লোকায়ত রাগ শবরী, গোণ্ডাকিরী ইত্যাদির সৃষ্টি হয় পাল রাজত্বে।

পাল রাজত্বেই আবার এই বাংলায় প্রবন্ধ গানের প্রচলন হয়। এই প্রবন্ধ গানের মাধ্যমেই পাল রাজাদের কীর্তি লোকায়ত সঙ্গীতের আকারে বিভিন্ন পালার মাধ্যমে রাখাল ও বিভিন্ন বণিকদের মুখে শোনা যেত। মহীপালের গীত পাল রাজত্বের বহু পরেও প্রচলিত ছিল। সেই সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস (ষোড়শ শতকের কবি) লিখেছেন—

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত
ইহা শুনিতে সে সর্বলোক আনন্দিত ॥"

ত্রয়োদশ শতকের পূর্বেও এই বঙ্গভূমিতে যে সংগীত চর্চা হ'ত তাও ব্যাপক। বিভিন্ন রাগের অনুশীলন চলত এবং তাও দিল্লীর দরবারকে কেন্দ্র করে। লোচনের 'রাগ তরঙ্গিণী' থেকে খুব স্পষ্টই বোঝা যায় ঐ সময়ের বাংলার সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চার কথা।

বল্লাল সেনের সভাকবি ছিলেন লোচন এবং তার উক্ত গ্রন্থটিতে চর্য্যাপদ, গীত-গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদির গায়ন পদ্ধতি, বিভিন্ন সুর ও তাল সম্পর্কে জানা যায়।

সেন রাজত্বে (লক্ষ্মণ সেনের সময়) বুঢ় মিশ্ররাজ পটমঞ্জরী রাগের আলাপ ক'রে জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গীতের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সে কথাও আমরা ইতিহাসে পেয়েছি। জয়দেব এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী লক্ষ্মণ সেনের সভায় বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

এই যুগেই অঙ্গ, ধাতু ও তাল সহযোগে নাচের বিভিন্ন ছন্দের সৃষ্টি হয়। সেই সময় জয়দেবের পদাবলী যে সব রাগে গাওয়া হতো তা হলো মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকেলী, দেশ, ভৈরবী, বিভাস ইত্যাদি। যে সব তালের উল্লেখ আছে তা হলো একতাল, অষ্টতাল, রূপক, যতি ইত্যাদি। ঐ রাগরাগিণী ও তালগুলি ভারতীয় সংগীতে স্বীকৃত। তার কিছু কিছু বিলুপ্ত হলেও তখনকার বহু রাগ ও তাল এখনও প্রচলিত তাই জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলার মধ্যযুগের সংগীতে এক নতুন ধারার সংযোজন।

চর্য্যাগীতি পদাবলী

আগেই বলেছি যে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাঙালীর সঙ্গীত সাহিত্যের সাধনার শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটেছে। আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন এই চর্য্যাগীতি।

প্রাকৃত ভাষা ভেঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রদেশ বলতে আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাট, মারাঠা ইত্যাদি প্রদেশের ভাষার সৃষ্টি হয় এই প্রাকৃত ভাষা ভেঙ্গে। সেন রাজত্বে এবং তার আগে বঙ্গভূমেও এই ভাষায় সাহিত্য চর্চা হত। অবশ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এ ভাষার কদর ছিল না। তবে সাধারণ মানুষ, বৌদ্ধ সহজ পন্থী ও নাথ পন্থীর মধ্যে এ ভাষার সমাদর ছিল। এরা বাংলা ভাষায় গান লিখতেন এবং সেই গানই বাংলা ভাষায় রচিত গীতের প্রথম সূচনা। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীরও বাংলা ভাষা অপভ্রংশ থেকে জন্মলাভ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগুরুর লেখা যে বইটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন সেইগুলিকে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। নেপাল থেকে শাস্ত্রী মহাশয় ৫১টি গান সম্বলিত বইটি প্রকাশ করেছেন। গানগুলির মধ্যে

কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কিত—কতকগুলি যোগ ও তান্ত্রিক মতবাদ সম্বলিত, আবার কতকগুলি যোগ ও তন্ত্রের আলোচনা সম্বলিত। এই চর্যাপদ 'সন্ধ্যা' ভাষায় লিখিত। একটি চর্যাপদের নমুনা উদ্ধৃত করা হোল—

"কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।"

চর্যাগীতি বৈষ্ণব পদাবলীর মতনই রচিত এবং চর্যাগীতির বিভিন্ন পদগুলি সেকালে এক বিরাট উল্লেখযোগ্য গীতি-সাহিত্যের সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নাই।

চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই গীতিকবিতার এই অবিচ্ছিন্ন ধারা বজায় রেখেছেন তাঁদের অমূল্য রচনার মাধ্যমে। চর্যাগীতিগুলি বাঙালীর ঐ গীতিপ্রবণতার ধারার উৎসের সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। চর্যাপদের শিরোনামায় বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামের উল্লেখ আছে। সেগুলির অধিকাংশই লোকায়ত রাগরাগিণী বলে অনুমান করা যায়, যেমন, বঙ্গালী, বরাড়ী, গুর্জরী, কামোদ, পটমঞ্জরী ইত্যাদি; এই রাগ-রাগিণীরা অনেকগুলি বৈষ্ণব পদাবলীতেও ব্যবহৃত হতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদ সম্পর্কে বলেছেন, "গানগুলি বৈষ্ণব কীর্তনের মত, গানের নাম চর্যাপদ। সেকালেও সংকীর্তন ছিল এবং কীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলিত।"

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতের ইতিহাসে যিনি আদি ও মধ্যযুগের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছিলেন তিনি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব গোস্বামী (১১১৯-১২০৫)। তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ থেকে জানা যায় তাঁর জন্মস্থান বীরভুমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে। আজও সেখানে জয়দেবের জন্মস্থান উপলক্ষ্যে 'কেন্দুলির' মেলা বসে।

জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতার নাম ছিল বামাদেবী এবং পত্নীর নাম পদ্মাবতী। তিনি লক্ষ্মণ সেন দেবের সভাকবি ছিলেন এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরেও কিছুদিন কাটান। কথিত আছে জয়দেব সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। পদ্মাবতীও সঙ্গীতে নিপুণা ছিলেন।

কালিদাসের পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য অর্থাৎ বাংলাভাষার প্রথম দিকের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব। জয়দেবের মধুর পদগুলি বাঙালীর সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে। বড়ু চণ্ডীদাস যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক ছিলেন, তাঁর রচনা থেকে শুরু করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনায় জয়দেবের প্রভাব লক্ষণীয়। জয়দেবের পদে নাটকীয় সংলাপ ও নাটকীয় ঘটনা আছে। কিন্তু পুরোপুরি মেলোড্রামা নয় তাঁর গীতগোবিন্দ। কারণ, সেখানে কোনো ট্র্যাজিডির আঙ্গিক নেই। এতে আছে আবেগের আতিশয্য, কাহিনীর সুদৃঢ় বন্ধন।

গীতগোবিন্দ আখ্যানকেন্দ্রিক ; রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের গান ও সংলাপের মাধ্যমে আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ পিশেল গীতগোবিন্দের নাটকীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে গীতগোবিন্দকে মেলোড্রামা বলেছেন।

নাটকীয়তা থাকলেও শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। গানগুলি শুধু গীতিমাধুর্যময় নয়, শিল্প-চাতুর্যেও গীতগোবিন্দ মনোরম।

ডঃ সুশীল কুমার দে বলেছেন, "ইহার উপর কাব্য স্মৃতি বিজড়িত যমুনার তট প্রান্তে, কখনো মেঘ-মেদুর বরষার নব সমারোহ, কখনো বা নববসন্তের সুরভি সৌন্দর্যে, বৃন্দাবনের না হউক, বাংলাদেশের তমাল শ্যামল বনভূমি যে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিত, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছায়াও জয়দেবের কান্ত কোমল পদাবলীর মাধুর্য-রসাসিক্ত ভাবরাজির সহিত বিচিত্রভাবে মিশিয়া গিয়াছে"।

মধ্যযুগের সঙ্গীত সাধনা

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগ চিহ্নিত হয়। কারণ এই সময় শুধু রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থারই অদলবদল হয়নি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। তবে পণ্ডিতদের মতে পুরোপুরি মুসলমান আধিপত্যের আগেই ভারতে সঙ্গীতের সর্বাধিক প্রচার ও বিকাশ হয়।

মঙ্গলকাব্যের যুগ (১২০০ শতক—১৮০০ শতক)

বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ শুরু হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এর পর থেকে ইংরেজ শাসনের আগে পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য গীতিকাব্যমূলক ছিল। মৃদঙ্গ, নূপুর, মন্দিরা ও চামর সহযোগে দলবদ্ধ বা এককভাবে গানের মাধ্যমে কাব্য পাঠ করা হ'ত।

এই দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করে যে গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাই 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। 'মঙ্গল' অর্থ কল্যাণ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাই বলেছেন : "ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনা, দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া যে গান রচিত হয় তাহাকে 'মঙ্গল' অথবা 'মঙ্গলগান' বলে। ইহার আর এক নাম অষ্টাহ গীত।" অষ্টাহ গীত অর্থ আট দিন ধরে এই গান গাওয়া হোত। এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হয়ে আর এক মঙ্গলবারে শেষ হ'ত। অবশ্য মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে মনসামঙ্গল পূর্ববাংলা অধুনা বাংলাদেশে শ্রাবণ মাস ধরে গাওয়া হোত। যে সুরে এই মঙ্গল গান গাওয়া হ'ত তাকেও মঙ্গল সুর বলতো। হিন্দীতে মঙ্গল মানে মেলা। কাশীতে বুঢ়ো মঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ মেলা হয়। যে গান শুনলে মঙ্গল হয়, অথবা যে গান মেলায় গীত হয় বা যে গান আরম্ভ হয়ে আট দিন ধরে চলে, তাকেই আমরা মঙ্গল গান বলে থাকি।

মঙ্গলকাব্যের উৎস

চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাসের লেখায় আছে

"মঙ্গলচন্ডী গীত করে জাগরণে
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন্‌জনে।"

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মঙ্গলচণ্ডী বা বিষহরির গান এদেশে চৈতন্য পূর্বেই প্রচলিত হয়। লোকমুখে ছড়ার আকারে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঁচালীর আকারে এগুলি লেখা হয়েছিল। তারপর পঞ্চদশ—ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রামীণ কবিরা মঙ্গলকাব্যকে একটা বিশেষরূপে রূপায়িত করেন।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয় এবং ঐ সময়েই মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। দেশের লোকেরা মুসলমান ধর্মের মাঝে নিজেদের অসহায় বলে মনে করে। তখন সমাজের মধ্যে আকস্মিক উৎপাত, পীড়ন, অন্যায়, অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মঙ্গলকাব্যে সেই সমস্ত দুঃখ ও উৎপীড়নের সমাধান টানা হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে। এই দেবদেবীর অধিকাংশই লৌকিক দেবতা। এরা হলেন মনসা, চন্ডী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায় ইত্যাদি। এই সব অনার্য দেবদেবীর আভিজাত্য বাড়িয়ে পৌরাণিক মর্যাদার স্বীকৃতির দেওয়া হয়। তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গীত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "শাক্তের চন্ডী বৈষ্ণবের শ্রী রাধার প্রভাবে কমনীয় রূপে আবির্ভূত হলেন। তাকে ঘিরে জন্ম নিল আগমনী বিজয়া গান।"

চর্যাপদের মতো মঙ্গলকাব্যে লৌকিক পাঁচালী সুর ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন রাগরাগিণী যথা--মল্লার, শ্রী, বসন্ত প্রমুখের উল্লেখ পাই। মঙ্গলকাব্য কাহিনীমূলক কাব্য, তাতে গীতিকবিতার বিভাগ নেই। ছন্দের মিল আছে। রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থাকলেও আমরা মঙ্গলকাব্যের ছন্দের গঠন প্রণালী লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাগরাগিণীর সুরেও এগুলি আবৃত্তি করা হোত অনেক ক্ষেত্রেই।

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

চর্যাপদের মতই পণ্ডিত বসন্ত রায় বিষ্ণুপুর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটি আবিষ্কার করে এক যুগান্তকারী সংযোজন করেন বাংলা সাহিত্যে। এই পুঁথি আবিষ্কারের আগে আমরা চন্ডীদাসের পদাবলীর মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রচয়িতা চন্ডীদাস কি একই ব্যক্তি যিনি বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলি রচনা করেছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি পাওয়া গেছে আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই পুঁথিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাতে ষোড়শ শতাব্দীর চিহ্ন থাকলেও তার আগের রচনা বলে মনে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন বৈষ্ণব কবিদের রচনায় চন্ডীদাসের কাব্যের উল্লেখ আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর জন্মের আগের কবি। তাই এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে অনুমান করা যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন অনেকটা গীতগোবিন্দের ধাঁচে লেখা গীতিনাট্য। এতে প্রাচীন যাত্রা-নাটক ও পাঁচালীর মাঝামাঝি একটা রূপ পরিলক্ষিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রের সংলাপে নাট্যরস অনেক ক্ষেত্রেই আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথমে জন্মখণ্ড। কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মা দেবগণকে নিয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্রীহরির স্তব করেন। শ্রীহরি বলরাম ও বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হতে স্বীকার করলেন। রোহিণী-দেবকীর গর্ভে তাঁদের আবির্ভাব ঘটায়। তারপর তাম্বুল খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বিরহখণ্ড ইত্যাদি খণ্ডে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশীর ভাগই পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে গাইবার জন্য যে সব রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে তা হলো কোড়া, বরাড়ী, পাহাড়ী, আহারে, বেলাচলি মালব, ভাটিয়ালী, কেদার, মঙ্গল, বিভাস, বাগেশ্রী, বসন্ত, পটমঞ্জরী ইত্যাদি রাগ-গুলির অধিকাংশই লৌকিক বা দেশী রাগ।

বৈষ্ণব পদাবলী

বৈষ্ণব পদাবলী গীতিধর্মীয় কাব্য। গীতিকবিতার মাধ্যমেই বাঙালী কবিরা প্রতিভা রেখে গেছেন তাদের বিভিন্ন পদাবলীর মাধ্যমে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তাদের এই গীতি কবিতা বাংলা সাহিত্যে জোয়ার এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী ও গীতাঞ্জলিতেও এই বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যযুগে বাঙালীর অধ্যাত্মবাদের সাধনা ও ভাবাবেগের পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় এই বৈষ্ণব পদাবলীতে। কাব্যিক অথচ ভাবাপ্লুত-রসাপ্লুত এই বৈষ্ণব পদগুলি বাঙালীর হৃদয়কে জয় করেছে। পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা বর্ণিত হয়েছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদগুলিতে স্থান পেয়েছে চৈতন্য প্রেমের প্রতিচ্ছবি।

বৈষ্ণব গীতি কবিতাগুলিকে প্রধানত : ৪টি ভাগে ভাগ করা যায় যথা—(ক) রাধা-কৃষ্ণ পদাবলী (খ) গৌড় পদাবলী (গ) ভজন পদাবলী (ঘ) রাগাত্মিক পদাবলী। মোটের উপর বৈষ্ণব গীতির সংখ্যা হল আট হাজারের মত।

কবি বিদ্যাপতি

পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির জীবনী নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। তাই তাঁর প্রকৃত জীবন কাহিনী উদ্ধার করা যায়নি। আমরা বিদ্যাপতিকে বহুদিন পর্যন্ত বাঙালী বলেই জানতাম, কিন্তু বর্তমানে তাকে অবাঙালী বলেই প্রমাণিত করা হয়েছে। মিথিলার দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারি মহকুমার বিসফী গ্রামে বিদ্যাপতির জন্ম হয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তার

পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীহরি মিশ্র ছিলেন তাঁর অধ্যাপক। পিতার সঙ্গে মিথিলার রাজা গণেশ্বরের রাজসভায় বিদ্যাপতি যাতায়াত করতেন। গণেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কীর্তিসিংহের দরবারে বিদ্যাপতি যোগদান করেন। মিথিলার পরবর্তী রাজা শিব সিংহের সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বিদ্যাপতিকে বিস্ফী গ্রাম দান করেন। বিদ্যাপতির রচনায় শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য বেশী। রাজসভা অতিক্রম করেও অন্তঃপুরে বিদ্যাপতির কাব্য রাজারাণীর পরিচারিকাবৃন্দের কণ্ঠে সুরের মাধ্যমে গীত হত।

শিবসিংহের মৃত্যু বা নিরুদ্দেশের পর আরও ত্রিশ বৎসর বিদ্যাপতি বেঁচে ছিলেন। অর্থাৎ মৃত্যুকালে বিদ্যাপতির বয়স আনুমানিক ৯০ বৎসর ছিল বলে কথিত আছে। তাঁর রচিত পুস্তকের মধ্যে কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, কীর্তিকৌমুদী, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী ইত্যাদি অন্যতম। ব্রজবুলি বা মৈথিলী ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীগুলি রচিত। ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, "চণ্ডীদাসের গ্রাম্যসঙ্গীত একতারার সুরে ঝংকৃত হয়েছে। বিদ্যাপতির সঙ্গীত কলাবিদকালোয়াতের হাতে বিচিত্র তন্ত্রীর সুরযন্ত্র"।

বিদ্যাপতির পদাবলী মৈথিলী ভাষায় রচিত হয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা। কারণ তাঁর মাতৃভাষা ছিলো মৈথিলী। তবে কালক্রমে তাঁর পদগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়ে গায়কদের কণ্ঠে কিছুটা রূপান্তরিত বা বিকৃত হয়। বঙ্গভূমেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই রূপান্তরিত ভাষার নাম ব্রজবুলি অর্থাৎ কৃত্রিম ভাষা। এটি কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়—সাহিত্যের ভাষা হিসাবেই এর পরিচিতি। ব্রজভাষা নামে হিন্দীভাষা থাকলেও তার সঙ্গে ব্রজবুলি ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। একথা সত্যি যে বিদ্যাপতি যেঅঞ্চলেরই লোক হউক না কেন বঙ্গভূমে তাঁর পদাবলীর ব্যাপক প্রচার হয় এবং বিদ্যাপতিকে বাঙালীরা বাঙালী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি।

এক সময়ে তরুণ বাঙালীরা মিথিলার ভাষা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাপতির পদগুলিকে যুগে যুগে আবৃত্তি করত।

তাই বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস যে মিথিলার কবি একথা তারা বিস্মৃত হয়ে বাঙালী বলেই গ্রহণ করেছিল।

পদাবলীর চণ্ডীদাস

আগেই বলেছি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস বা পদাবলীর চণ্ডীদাস অথবা আরও চণ্ডীদাস যাঁরা বৈষ্ণব সাহিত্যে আছেন তাঁদের নিয়ে পণ্ডিত সমাজে ধূম্রজালের সৃষ্টিহয়েছে। পদাবলীর চণ্ডীদাস ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলে অনুমান করা যায়। প্রবাদ অনুসারে চণ্ডীদাসের জন্ম বীরভূমের নান্নুর গ্রামে। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। মহাপণ্ডিত ছিলেন তিনি। শাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন। কীর্তনে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দলও ছিল। চণ্ডীদাসের ভনিতা থেকে জানা যায়

তিনি বাশুলী দেবীর বরে কাব্য রচনা করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি বাসলীর দেরাসিনী রামীর প্রেমে পড়েছিলেন। রামী একজন বিধবা রজকী ছিলেন। রামীর প্রেমে পড়াতে চণ্ডীদাসকে জাতিচ্যুত করা হয়েছিল। চণ্ডীদাসের গানে রামীর উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাস খাঁটি বাঙালী কবি। বাংলা ভাষায় বহু গান তিনি রচনা করেছেন। তাঁর প্রেমগীতিগুলি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে রাগরাগিণীর নির্দেশ পাওয়া যায় তা হল. কামোদ, বরাড়ী, আশাবরী, রাগশ্রী, মালব, ধানশ্রী, জয়শ্রী, কানাড়া, কল্যাণ, পটমঞ্জরী, শ্রী, বিভাস ইত্যাদি রাগ।

জ্ঞানদাস

চণ্ডীদাসের উত্তর সাধক জ্ঞানদাস কাটোয়ার কাঁদরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে। চণ্ডীদাসের মতোই তাঁর পদাবলীতে ধ্বনিত হয় আধ্যাত্মিকতার সুর। চণ্ডীদাসের মনে যে গভীরতা ছিল রূপকে ধরে রাখার যে কল্পনা ছিল জ্ঞানদাসের ততটা ছিলনা। জ্ঞানদাস রোমান্টিক বৈষ্ণব কবি। তাই তার রোমান্টিক মন রাধিকার অন্তরকে এইভাবে দেখে—

"শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণ বান্ধা।"

ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় জ্ঞানদাস তাঁর পদও রচনা করেছেন। তবে বাংলা পদগুলি শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতির প্রভাব থাকলেও স্বকীয়তা আছে তাঁর রচনায়। তাঁর একটি বহু জনপ্রিয় পদের কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

"বঁধু তোমারি গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা রাখি মোর বুকে।"

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসরণকারী কবি। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ধমানে তাঁর জন্ম হয়। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ছিল গোবিন্দদাসের। তঁার রচিত পদে মিশেছে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি।

চৈতন্য পরবর্তী কবিদের প্রায় সকলের মধ্যেই প্রেমের সমন্বয় ঘটেছে। গোবিন্দদাসের প্রতিভার দুটি দিক ছিল। প্রথমটি হ'ল তাঁর চাপল্য, আর অন্যটি হলো গাম্ভীর্য। গোবিন্দদাস তাঁর রচিত পদে বহু অলংকার ব্যবহার করেছেন। অভিসারের পদগুলিতে গোবিন্দদাস সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রেমের অনুভূতি এত সুন্দরভাবে অন্য বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে খুব একটা পাওয়া যায় না।

বলরাম দাস

বলরাম দাস একজন রসের কবি ছিলেন। বলরাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন—"বাৎসল্য মধুরের পূর্বরস, রসোদ্গার প্রণয়ের প্রৌঢ়তম অবস্থা। এই দুই প্রান্তের লীলারস উপভোগ করিয়াছেন প্রবীন রসিক বলরাম দাস।" বলরাম দাসের পদগুলি বাস্তবধর্মী। প্রেমিক পুরুষকে বলরাম দাস পতি ও পিতা এই দুইরূপে দেখেছেন। তাঁর কাব্য রাধাসর্বস্ব।

রায়শেখর

চৈতন্য পরবর্তী আর একজন পদকর্তা ছিলেন রায়শেখর। তাঁর ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতিরই মত। রাধাকৃষ্ণ মিলন, সূর্য্য পূজার ছলে মিলন, জলক্রীড়া ইত্যাদি নানাধরনের পদও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় অলংকারও আছে।

নরোত্তম দাস

নরোত্তম দাস চৈতন্যত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। তিনি শুধু পদকর্তাই ছিলেন না। বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করবার জন্যই জীবন দিয়েছেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৬৫ খ্রীঃ) উত্তরবঙ্গের রাজশাহীতে খেতুড়ী গ্রামে এক বিখ্যাত জমিদার বংশে নরোত্তমের জন্ম হয়। ১৬ বৎসরেই তিনি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর তিনি বাংলায় ফিরে আসেন। খেতুরীতে সন্ন্যাসীর মতন তিনি দিন কাটান। নরোত্তমের প্রচেষ্টায় খেতুড়ীতে ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দশদিন ধরে এক বিরাট মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয় আনুমানিক ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই উৎসব বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে খেতুড়ী মহোৎসব নামে খ্যাত। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব এই খেতুড়ী মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। এদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনিবাস, বৃন্দাবনদাস, পদকর্তা গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতিও ছিলেন। নরোত্তম দাস যে লীলা কীর্তন করেছিলেন তা গরাণহাটী নামে পরিচিত। খেতুড়ীতে তিনি যে কীর্তন করেছিলেন তা ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন।

বহু গ্রন্থ নরোত্তম লিখেছেন। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলি সে সব গ্রন্থে আছে। নরোত্তমের প্রার্থনার পদগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

কীর্তন

বৈদিক ঋষিদের গানের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনার কথা আমরা ইতিহাসে পেয়েছি। তারা সবাইএকে একে কালের গর্ভে ডুবে গেছেন। সে বহুবছর আগের কথা।

দ্বাদশ শতকে প্রাক্‌চৈতন্যযুগে জয়দেবের বাঁশীর সুরে শুনেছিল বিশ্ববাসী "অমৃতময়ী আশার বাণী"। তারপর সুদীর্ঘ তিনশ বছর কেটে গেল। পঞ্চদশ শতকে এই জাতির জীবনে দেখা দিল এক নতুন আলো। বীরভূমে অজয় নদীর তীরে

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব জন্ম নিলেন। চন্ডীদাস উদয় হলেন করুণ বিরহ বাঁশীর সুর নিয়ে। সেই সঙ্গে বিদ্যাপতির বাঁশীতে বেজে উঠলো বসন্তের মিলন লহরী।

ষোড়শ শতক এলো। জন্ম নিলেন চৈতন্যদেব। তিনি প্রেমরসে সবার মন ভাসিয়ে দিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে কীর্তনের ব্যাপক প্রচার করেন শ্রীচৈতন্যদেব।

মহাপ্রভুর সময় চন্ঠীদাস, বিদ্যাপতির গান-গীতগোবিন্দের কীর্তন গাওয়া হত। এর পরেও এলেন প্রায় তিন শতাধিক বৈষ্ণব কবি। রচিত হল প্রায় দশহাজার পদকীর্তন। একথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাপ্রভুর সময়ে পদকীর্তনের প্রচার হয়নি। শুধু হয়েছে নামকীর্তনের প্রচার। পদকীর্তন শুধু স্বরূপ দামোদর, শিখিমাইতি, মাধবী-বৈষ্ণবী এরাই গাইতেন। তাদের সঙ্গে মহাপ্রভুও অনেক সময় যোগদান করতেন। পদকীর্তনের প্রচার সে সময়ে সাধারণের মধ্যে না করার একটা উদ্দেশ্যও ছিল। কারণ প্রত্যেকটি পদই নায়ক-নায়িকাকে কল্পনা করে রচিত ছিল। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদের তত্ত্বের মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না ঘটে তার জন্যই পদকীর্তনের প্রচলন সে সময়ে হয়নি। কিন্তু মহাপ্রভুব পরে এই নিয়মকে কেউ মানেননি। রসকীর্তন, লীলাকীর্তন মহাপ্রভুব সময় থেকেই প্রচার হতে শুরু হয়। এই রসকীর্তন ও লীলাকর্তীন বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। লীলাকীর্তন প্রবর্তিত হয় রাধামোহন ঠাকুরের দ্বারা। তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থ, 'ক্ষণদা চিন্তামণি'তে প্রত্যেকটি গানের সাথে গৌরচন্দ্রিকা যুক্ত করে কীর্তন গাইতে নির্দেশ দিয়েছেন। গৌরচন্দ্রিকা তাই পদের পরিচয় দেবার একটি উল্লেখযোগ্য নির্দ্দেশক। প্রত্যেকটি কীর্তন গানের মধ্যেই রস ফুটে ওঠে। পদকীর্তনে সাধারণতঃ চারটি রস বর্ণিত হয়েছে। যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর রসেব আধিক্যই বেশী, মহাপ্রভুও এই মধুর রসের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু ষোড়শ শতকে বাংলায়ই নয় উড়িষ্যা, আসাম ও মণিপুরেও ছড়িয়ে পড়লো কীর্তনের গীতলহরী। ভারতবাসীর প্রাণে দোলা দিল কীর্তনের প্রেমভরা সুরলহরী।

চৈতন্যপূর্বে কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। মহাপ্রভুর সময় থেকেই কীর্তনীয়ারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করল এবং কীর্তনের বিভিন্ন ধারাও সৃষ্টি হয় এই সময় থেকে। যথা, মনোহরশাহী, গরাণহাটী এবং রেনিটি। মনোহরশাহীর উদ্ভব হয় বীরভুম জেলায় বোলপুরে মনোহরশাহী পরগণা থেকে। রাজশাহী জেলার খেতুর অঞ্চল থেকে গরাণহাটী ধারা আর উড়িষ্যায় রেনিটি ধারার উৎপত্তি হয়। রেনিটির প্রচারকর্তা শ্যামানন্দকে 'গৌড় উৎকলা' বলে অভিহিত করা হয়। সব ক'টি ধারা স্ব স্ব অঞ্চলে উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তবে মনোহরশাহীকেই বেশীর ভাগ লোক গ্রহণ করেছিল। ফলে অন্য ধারাগুলি প্রায় অবলুপ্তির পথে। কোন কোন অঞ্চলে তিনটি ধারাকে একত্রিত করেও গাওয়া হয়।

কীর্তন গানে ভক্তিপ্রাণের আকুলতা ফুটে উঠলেও শ্রোতা এবং গায়ক উভয়কেই এর

রসের অনুভূতি গ্রহণ করতে হবে। নামকীর্তন সবার সংগেই করা চলে। কিন্তু লীলাকীর্তন বা রসকীর্তনের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।

কীর্তনের প্রচলন দিনে দিনে কমে আসছে। একদিন জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই এই কীর্তনের সুরে মেতে উঠতো। স্ত্রী-পুরুষ সবার মনে কীর্তনের সুরের প্লাবন এনেছিল। ভক্তিরসের সঞ্চার ঘটেছিলো। আজ যান্ত্রিক সভ্যতায় নামকীর্তন আর তেমনি করে সুদূর পল্লীবাসীর প্রাণেও স্পন্দন জাগায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অনন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়বেগ।"

শাক্তপদাবলী

মধ্যযুগে বৈষ্ণব ও শাক্তধারা প্রবাহিত হয়েছিল পাশাপাশি। শাক্ত কবিরা বৈষ্ণব কবিদের মতন বহু পদাবলী ও গানের মাধ্যমে এই শাক্তধারা অব্যাহত রেখেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এই শাক্তপদাবলীর নতুন ধারা আমরা দেখতে পাই। শ্যামা মাকে কেন্দ্র করে শাক্তপদাবলী রচিত হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখেছি কৃষ্ণ ও কালী এক হয়ে গেলেন এই শাক্ত পদাবলীতে।

শাক্তপদাবলী সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। যথা—

(ক) ভক্তিমূলক বা তত্ত্বমূলক শ্যামাসঙ্গীত।

(খ) বাৎসল্য রসাশ্রিত আগমনী ও বিজয়ার গান এবং উমাসঙ্গীত।

উমাসঙ্গীতের মূল বক্তব্য কন্যা উমা বা মেনকা দুর্গাকে নিয়ে। বছরে একবার করে কন্যা পিতৃগৃহে আসেন. তিনদিন থেকে আবার বিজয়ার দিন চলে যান সকলকে কাঁদিয়ে। প্রকৃতপক্ষে আগমনী গানে বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। শাক্ত পদাবলীতে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের গান লিখেছেন। যেমন, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গিরিশচন্দ্র ও আরও অনেকে। এর মধ্যে রামপ্রসাদই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ সেন নৈহাটির নিকট হালীশহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮ থেকে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামরাম সেন। রামপ্রসাদ রামরামের দ্বিতীয় পুত্র। শাক্তবংশে রামপ্রসাদের জন্ম হয়। আদিপুরুষ ছিলেন কৃত্তিবাস। রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। একসময় নবাব সিরাজদৌল্লাও তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

পিতার মৃত্যু ঘটে অভাব অনটনের তাড়নায়। রামপ্রসাদ কলকাতার কাছে এসে জমিদারের এক সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ নিলেন। হিসাবপত্রের পাতায় কবি গান লিখে রাখতেন। জমিদার একদিন তাঁর হিসেবের খাতা দেখতে গিয়ে ঐসব গান দেখেন। ঐ গানগুলির মধ্যে একটি গান হলো—

"আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী"।

ঐ গান দেখে জমিদার তাঁকে চাকরী থেকে ইস্তফা দেন বটে, কিন্তু একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্যামাসংগীত লেখার অনুপ্রেরণা দেন। সেই থেকে কবি কুমারহট্টের সাধনপীঠে বসে তাঁর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে গান লিখতে থাকেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নদীয়ার রাজা। তিনিও রামপ্রসাদের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কথিত আছে তিনি কবিকে ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন এবং 'কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত করেন। রামপ্রসাদ সম্পর্কে নানাধরনের কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে, কন্যারূপে কালী এসে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। আবার এও শোনা যায় যে কালী নাম করতে করতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের যে দুখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে কৃষ্ণকীর্তন ও কালী কীর্তন বই দুটি উল্লেখযোগ্য। আগমনী গানের প্রথম কবি রামপ্রসাদ। ভরতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেছিলেন। এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে সে যুগের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রসাদী গানে সামাজিক জীবনের কলুষতার বর্ণনাও খুঁজে পাওয়া যায়। তার কাব্যে বা গানে অপূর্ব কাব্য পরিচয় পাওয়া যায়। গান গেয়ে তিনি কালীসাধনা করেছেন। কীর্তনভাঙা এক বিশেষ ঢং-এর সুরের সাথে প্রাচীন বাংলা গানের সুর মিশ্রিত করে বিভিন্ন রাগরাগিণীর কাঠামোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সেই গানের সুর রচনা করেছেন রামপ্রসাদ।

শ্যামাসঙ্গীত হিসাবে রামপ্রসাদ প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁর আগমনী গানগুলির মধ্যে এক অপূর্ব প্রাণস্পন্দন খুজে পাওয়া যায়। শ্যামাসংগীতে তিনি যেমন কালীকে কন্যারূপে, মাতারূপে. আপন করতে পেরেছেন তেমনি আগমনী গানের মধ্যেও উমাকে কন্যারূপে আর মেনকাকে মাতারূপে কল্পনা করতে এবং হৃদয়ের আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততা দিয়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর আগমনী গানের দুটি কলি আজও আমাদের কানে ভাসে—

'গিরি এবার উমা এলে
আর উমায় পাঠাবো না
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারও কথা শুনব না'।

কমলাকান্তের শাক্তসঙ্গীত

রামপ্রসাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কালনার অম্বিকানগরে তাঁর মূল বাসস্থান ছিল। তবে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোটালহাটে বাস পরিবর্তন করেন। তিনি শুধু গীতিকারই ছিলেন না বর্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিতও ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের মত কালী সাধকও ছিলেন। তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মিশ্রিত। কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত বা আগমনী গানে উচ্চ কাব্যরস ও মানবিক রসের পরিচয় পাই। তত্ত্বকথার সঙ্গে ভক্তিরসের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন

চৈতন্যোত্তর যুগের নরোত্তম দাস খেতুরীর মহোৎসবে নূতন ধরনের লীলাকীর্তনের প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন ঐ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। তার এই পদ্ধতি গরাণহাটীনামে প্রচলিত। তাঁর কীর্তনে ধ্রুপদের মত আলাপের পর মূল গানপরিবেশিত হত, 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে তার এই কীর্তনের বিবরণ পাওয়া যায়। পরে তাঁর এই গরাণহাটী কীর্তনের ধারার পরিবর্তন করা হয় এবং গায়ন পদ্ধতিকে সরল করে পরিবেশিত করা হয়।

এবার বিষ্ণুপুরের কথায় আসা যাক। বিষ্ণুপুরে কিভাবে সঙ্গীতচর্চা চলত সেটাই দেখা যাক।

বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত সাধনা

পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও রাঢ় এই তিনভাগে বঙ্গভুমি বিভক্ত ছিল। বর্তমানে রাঢ়ের যে অংশে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত অতীতের সেই অংশটি ছিল বিষ্ণুপুরে। এই বিষ্ণুপুর ছিল বাংলা দেশের ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চার প্রাচীন কেন্দ্র। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মল্লবংশের রাজা রাজমল্লের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর সঙ্গীত সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। ১৫৫৬-১৬০৫ এই বিষ্ণুপুরের এক রাজা ছিলেন বীর হাম্বীর। তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং কতকগুলি সঙ্গীত ও পদাবলী রচনা করেন।

বিষ্ণুপুরের রাজা চৈত সিংহের পুত্র নিমাই সিংহ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ। তিনি 'রাগমালা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সঙ্গীত সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাউদ্দীন খিলজীর যুগ থেকে আরম্ভ করে মোগল বাদশাহী শাসনের শেষ পর্যন্ত দিল্লী সঙ্গীত চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। এই বিষ্ণুপুর ছিল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবস্থল। বলতে গেলে এই বিষ্ণুপুর ছিল সংগীত জগতের রাজধানী।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মল্লরাজ বংশের ৪২তম নরপতি পৃথ্বীমল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে সর্বপ্রথম সংগীতশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয়। তিনি সংগীত শিক্ষা ও প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন। সেই সময় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। এই বংশের বহু বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ যেমন শ্যামচাঁদ, কানাই, ও মাধব চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরা সঙ্গীত চর্চায় বিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করেন। বাহাদুর খাঁর পর গদাধর চক্রবর্তী রাজসভার সঙ্গীত অধ্যাপকের পদে

প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কৃষ্ণমোহন গোস্বামী। তিনি বিষ্ণুপুর রাজসভায় সংগীত অধ্যাপকের পদলাভ করেছিলেন।

কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। তিনি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু শিক্ষার্থী তাঁর কাছে সংগীতশিক্ষার জন্য আসত। তাঁর রচিত 'কণ্ঠ কৌমুদী' ও 'সংগীতসার' গ্রন্থ বহু সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও দীনবন্ধু গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। এরা বাংলাদেশে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য ছিল অনন্তলাল। তাঁর পুত্রদের মধ্যে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মৃদঙ্গ বাদ্যে পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি একখানি পুস্তক রচনা করেন। তার নাম 'মৃদঙ্গ-দর্পণ'। এই অনন্তলালের দ্বিতীয় পুত্র ছিল গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচিত দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ 'সংগীতার্ণব' ও 'সংগীত চন্দ্রিকা'।

বিষ্ণুপুরের অন্যতম খ্যাতনামা সংগীতাচার্য্য ছিলেন যদুভট্ট। তিনি বিভিন্ন রাজসভায় সংগীত অধ্যাপকের পদ পেয়েছিলেন।

মৃদঙ্গ বাদ্যে যারা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ওস্তাদ পীরবক্স ও জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ছিলেন সংগীত সাধকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতার নাম গদাধর ভট্টাচার্য্য। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজার সভাপণ্ডিত। শুধু সংগীতেই নয় সংগীতশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি রাগরাগিণীর বিশুদ্ধ আলাপের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত সংগীতগুলি বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। তিনি বহু ভাবপূর্ণ উচ্চাঙ্গের গান লিখেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যদুনাথ ভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য। এইজন্য রামশঙ্করের মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুপুর রাজের রাজসভায় সংগীতাচার্য্যের পদটি পান। তাঁর সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন হরগোপাল সিংহ। তিনি অনন্তলালের সংগীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'সংগীত কেশরী' উপাধি প্রদান করেন। মহারাজের দুই পুত্র তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করে বিশিষ্ট গায়ক হিসাবে পরবর্তীকালে খ্যাতি লাভ করেছিলো। মহারাজ গোপালসিংহের এক পুত্র ছিলেন মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর। তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ে কণ্ঠসংগীত শিক্ষা করেন। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে

রাধিকামোহন গোস্বামী, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাসভূমি ছিল মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায়। ক্ষেত্রমোহন রামশঙ্করের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসেন এবং যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত সভায় গায়ক নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে তিনি সর্বপ্রথম আর্কেষ্ট্রা গঠন করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বেলগাছিয়ায় নাট্যশালার 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের সময় এঁর প্রথম অনুষ্ঠান হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন তাঁদের প্রাসাদে 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়' স্থাপন করেন। এই নাট্যালয় থেকে তাঁর 'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি' বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষেত্রমোহন শেষ বয়সে "বেঙ্গল অ্যাকাডেমি তার ম্যুজিক" থেকে "সঙ্গীত নায়ক" উপাধি পেয়েছিলেন। এখান থেকে তিনি 'স্বর্ণ কেয়ুর' লাভ করেন।

তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রথম স্বরলিপি রচনা করেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট সংগীত রচয়িতা ছিলেন। তাঁর স্বরলিপি ছিল অক্ষর মাত্রায়। তিনি ধ্রুপদ গান রচনা করতেন। বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত এই তিন ভাষায় তিনি ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন রামশংকর ভট্টাচার্য্য। তিনিও ধ্রুপদ গান রচনা করতেন। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে গীত গোবিন্দের স্বরলিপি, কণ্ঠ-কৌমুদী, সংগীতসার, একতানিক স্বরলিপি, আশুরঞ্জনীতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

যদু ভট্ট

যদু ভট্ট ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংগীতগুরু রামশংকর ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি হিন্দী ভাষায় অনেক গান রচনা করেছিলেন। পঞ্চকোটের রাজা এবং ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর তাঁকে যথাক্রমে "রঙ্গনাথ" এবং "তানরাজ"উপাধি দান করেন। যদু ভট্ট বাংলাভাষাতেওঅনেকধ্রুপদ রচনা করেন। "সংগীত মঞ্জরী" গ্রন্থে তার বাংলা ও হিন্দী গানগুলি প্রকাশিত হয়েছে। রামেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে তার কয়েকখানি গানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্ঠতা ছিলো তা অন্য কোনো হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। তাঁর মতো সংগীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ'।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

রাধিকাপ্রসাদ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগৎচাঁদ

গোস্বামী ছিলেন একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক। পনেরো বছর বয়সে কলকাতায় এসে বেতিয়া ঘরানার ধ্রুপদী শিবনারায়ন মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে অনেক গানে তিনি সুর সংযোজন করেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটায় একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সংগ্রহ ছিল প্রচুর। ১৯২৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন।

বাংলায় ধ্রুপদের চর্চা

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলাদেশে ধ্রুপদের চর্চা শুরু হয়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, হুগলী জেলার চুঁচুড়া, এবং মুর্শিদাবাদে ধ্রুপদ চর্চার কেন্দ্র ছিল। দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় থেকেই দিল্লীর দরবারের সংগীতজ্ঞরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। ওস্তাদ মান খাঁ, ওস্তাদ বড়ে মিঞা, হাসসু খাঁ প্রভৃতি বাংলা দেশে চলে আসেন।

রামচাঁদ গোস্বামী, ওস্তাদ রসুল বক্সের যোগ্য শিষ্য ছিলেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দিনে তিনটি সংগীত গাওয়া হয়েছিল। গান তিনটি যথাক্রমে 'শ্বাশ্বতভয় শোকং', 'বিগত বিশেষং' এবং 'ভাবো সেই একে'। এই তিনটি গানকে প্রথম ব্রহ্মসংগীত বলা যায়। এই গানগুলিতে ধ্রুপদের মত অনেকটা গাম্ভীর্য দেখা যায়। রামমোহন রায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সংগীতকে একটি বিশেষ অংগরূপে পরিগণিত করেন। তাঁর রচিত গানগুলি ধ্রুপদ ও খেয়াল সুর অবলম্বনে রচিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের উপসনায় প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদকগণ যোগদান করতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা উচ্চাংগ সংগীত চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এবং সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উচ্চাংগ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। যতীন্দ্রমোহন সঙ্গীত এবং সাহিত্য উভয়েরই পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। সৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীতের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিন্দু এবং মুসলমান ওস্তাদেরা জলসা ও মাইফিলউপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসতেন। তাদের গায়ন ভঙ্গী কিন্তু একরূপ ছিলনা। সেজন্য বিভিন্ন ধ্রুপদী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে কলকাতায় একটি সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লাহোর থেকে আলীবক্স, দৌলত খাঁ; বরদা থেকে মৌলাবক্স; গয়া থেকে হনুমান দাসজী প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদরা কলকাতায় আসেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাইরে থেকে যে সব ধ্রুপদী কলকাতায় আসেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলি খাঁ এবং উজীর খাঁর নাম উল্লেখ করা যায়।

কলকাতা শহরে ধ্রুপদ ও টপ্পার সঙ্গীতের চর্চা

রবীন্দ্রনাথের যখন শৈশবকাল তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে ধ্রুপদের চর্চা হত। তখন উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশক। ঠাকুর বাড়ীতে বেশীর ভাগ অনুষ্ঠানে ধ্রুপদ এবং ধামার গাওয়া হত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় উপাসনা গৃহে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ধারায় ব্রহ্মসঙ্গীত চালু হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই ধরনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিজেই রচনা করতেন।

সেই সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা হত। রবীন্দ্রনাথের দাদারা এবং দেবেন্দ্রনাথ প্রায় ৬০টি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বড় বড় ওস্তাদরা তাঁদের তাতে সহযোগিতা করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীতে সব ওস্তাদরা আশ্রয় নিতেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতেন. তখনকার সময়ের বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ মৌলাবক্সও তাঁদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। অযোধ্যা. গোয়ালিয়ার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ওস্তাদরা আসতেন। রবীন্দ্রনাথের বড় ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ধ্রুপদ গান গাইতেন। তিনি তখনকার দিনে নামকরা সেতারী জুয়ালাপ্রসাদের শিষ্য ছিলেন। শৈশবে যদু ভট্টের গান রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। বড় বড় ওস্তাদদের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর ধ্রুপদ ও ধামার গান রচনা করেন।

এই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ছাড়া কলকাতায় আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ধ্রুপদ গানে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। যেমন, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, শতীশচন্দ্র দত্ত, মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়. কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় ইত্যাদি। এছাড়াও আমরা গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর নাম করতে পারি। তিনি ধ্রুপদ গান ছাড়াও ঠুংরি গানে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এছাড়া যোগীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ধ্রুপদ গানকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এইভাবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে বাংলাদেশে ধ্রুপদ চর্চা চলে আসছে। সে সময় বৈষ্ণবগণ যে সব সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলি দেখলে বোঝা যায় বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরও চর্চা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমরা টপ্পার প্রচলন দেখতে পাই। সে যুগে রামনিধি গুপ্ত,(নিধুবাবু) ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন—এঁরা টপ্পা এবং টপ খেয়ালের প্রচলন করেন। তাঁদের সময় খেয়াল গান বাংলাদেশে আসেনি। টপ্পা এবং খেয়ালের মিশ্রণে এই টপ-খেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল। এতে মোটা-দানার তান ও গমক ছিল। সে সময় এই সঙ্গীতের চর্চা ছাড়াও বৈঠকী গানের আলোচনা হত। এই সময় টপ্পা ও টপ খেয়াল বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রামনিধি গুপ্ত নতুন ধরনের টপ্পার প্রবর্তন করেছিলেন। সেই সময় দেওয়ান রামদুলাল, রঘুনাথ রায়, হরু ঠাকুর —এঁরা বহু সঙ্গীত রচনা করেন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচলন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলা গান তার নিজস্ব একটি রূপ নিয়ে বিকশিত হতে থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ যেমন খাম্বাজ, বাগেশ্রী, ভীমপলশ্রী, পূরবী, সাহানা, গৌড়, বসন্ত, মুলতান প্রভৃতি রাগের প্রচলন দেখা যায়। সেই সঙ্গে কিছু তালের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। যেমন—বারো মাত্রার একতাল, আড়া, পোস্তা মধ্যমান, ১৬ মাত্রার আড়াঠেকা, ৮ মাত্রার যৎ ইত্যাদি। এই সময় বাংলা গানের গায়নপদ্ধতি ও রাগরূপ হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল।

রামায়ণ গান, ঝুমুর, তরজা, কবিগান, শ্যামাসংগীত, কথকতা, কৃষ্ণযাত্রা—এগুলির মাধ্যমে পাঁচালী এবং বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী গানের ব্যাপক প্রচলন হয়।

যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী, নাট্যকার মনমোহন বসু, শ্রীধর কথক, দাশরথি রায়, রসিক রায় ইত্যাদি এদের গানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নতুন রূপ দেখা যায়। এই সময়ে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, আগরতলা, গোবরডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবে খেয়াল এবং ধ্রুপদের চর্চা হতে থাকে।

এই সময় ধ্রুপদ এবং খেয়াল এই দুই প্রকার গানেরই চর্চা করেছেন এইরকম বহু ওস্তাদের নাম করা যায়। তাঁরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। এঁরা হলেন বড়ে মিঞা, হদ্দু খাঁ, কাশেম আলী খাঁ, আমীর খাঁ, রজব আলি খাঁ, রহমৎ খাঁ, মৌলা বক্স, রহিম বক্স, মহম্মদ খাঁ, পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর, বিশ্বনাথ রাও, পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, উজীর খাঁ শিবনারায়ণ মিশ্র, রামশংকর বন্দোপাধ্যায়, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিজাশংকর বন্দোপাধ্যায় বেহালার বামাচরণ বন্দোপাধ্যায় ইত্যাদি।

বাংলায় হিন্দুস্থানী খেয়ালের প্রচলন

ক্রমে ক্রমে বাংলায় হিন্দুস্থানী খেয়াল প্রসারিত হতে লাগল। এই খেয়াল প্রথম বাংলাদেশে যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে শিবনারায়ণ মিশ্র, পণ্ডিত গুরুদাস মিশ্র, কলকাতার নুলো গোপাল এবং হরিনাভির অঘোরনাথ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও বাংলাদেশে খেয়াল গান প্রচারে যাঁরা বিশেষ সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে বেহালার বামাচরণ বন্দোপাধ্যায়, রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, আগ্রার ফৈয়াজ খাঁর নাম উল্লেখ করা যায়। বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুস্থানী এবং বাংলা খেয়াল গানের প্রচলন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। অনেকে বাংলা গান রচনা করে হিন্দুস্থানী ঢং-এ পরিবেশন করতেন।

তাঁদের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, শিবপুরের নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর নাম উল্লেখ করা যায়। এরা ধ্রুপদ গানে টপ্পা-ভঙ্গীর তান প্রয়োগ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দুজনেই ধ্রুপদ, খেয়াল এবং টপ্পা এই তিন ধরনের গানই রচনা করে গেছেন।

অতুলপ্রসাদ সেনও টপ-খেয়াল রচনা করে গেছেন। খেয়ালে প্রথম আলাপ সংযোজন করেন আব্দুল করিম খাঁ এবং তিনিই খেয়ালে প্রথম সরগম্ ব্যবহার করেন। ওস্তাদ নাম্নে খাঁ বিলম্বিত, দ্রুত এবং মধ্য লয়ে খেয়াল গাইতেন। তিনি খেয়াল গান গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়
বিভিন্ন ঘরানা

সঙ্গীতে ঘরানা শব্দটির অর্থ বংশ-বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ গায়ন পদ্ধতির বিশেষ রীতি। ঘরানা বলতে গানের বাণীটাকেই মুখ্য বোঝায় না। সুর, রাগ এবং তালের যে প্রকাশভঙ্গী তার বৈচিত্র্যের জন্যই বিভিন্ন ঘরানার উদ্ভব হয়েছে। এক একটি ঘরানায় আমরা ভিন্ন ভিন্ন রকম বৈচিত্র্য দেখতে পাই। এই বৈচিত্র্য থাকে বলেই বিভিন্ন সংগীতজ্ঞের বিভিন্ন সঙ্গীত বিশেষ বিশেষ আস্বাদন সৃষ্টি করে থাকে। এর পিছনে সামাজিক রুচি ও প্রভাব বিস্তার করে। জালাউদ্দীন খিলজীর সময় থেকে এই ঘরানার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ধ্রুপদ সৃষ্টির আগে থেকে ধ্রুপদ এবং খেয়ালের বিভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। ধ্রুপদের চারটি গায়কী ঢং আছে। যেমন—গোড়হার, ডাগর, খাণ্ডার এবং নোহার। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর 'Hindusthani Music and Mian Tansen' বইতে ১৫টি ঘরানার উল্লেখ করেছেন। যেমন—

(১) ধ্রুপদ এবং রবাব-এর সেনী ঘরানা।
প্রতিষ্ঠাতা—লক্ষ্মৌ এবং বারাণসীর জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বসৎ খাঁ।

(২) খেয়ালের গোয়ালিয়র ঘরানা।
প্রতিষ্ঠাতা—খেয়াল গায়ক হসসু খাঁ এবং নাথথু খাঁ।

(৩) সেনী বীনকার ঘরানা।
প্রতিষ্ঠাতা—লক্ষ্মৌর নির্মল শাহ।

(৪) ধামারের আগ্রা ঘরানা।

(৫) ধ্রুপদের বেতিয়ার ঘরানা।
সৃষ্টিকর্তা—লক্ষ্মৌ-এর হায়দার খাঁ।

(৬) ধ্রুপদের বিষ্ণুপুর ঘরানা।
এটি বাংলার একেবারে নিজস্ব।
এর স্রষ্টা বিষ্ণুপুরের রামশংকর ভট্টাচার্য্য।

(৭) কাওয়াল ঘরানা।
প্রবর্তক—লক্ষ্মৌ এবং গোয়ালিয়রের বড়ে মহম্মদ কাওয়াল।

(৮) পাঞ্জাবের তিলমনড়ী ঘরানা।

(৯) লাহোর ঘরানা।
প্রবর্তক—শাহ সদারঙ্গ-এর শিষ্যরা।

(১০) ডাগর ঘরানা।
প্রবর্তক—বিখ্যাত বাইরাম খাঁ।

(১১) সেতারের সেনী ঘরানা।
প্রবর্তক—জয়পুরের অমৃত সেন।

(১২) শাহারানপুরের সরোদ ঘরানা।
প্রবর্তক—নির্মল শাহ সেনীর পুত্র এবং ওমরাও খাঁর শিষ্যবৃন্দ।

(১৩) লক্ষ্মৌ-এর সেতার ঘরানা।
প্রতিষ্ঠাতা—মহম্মদ খাঁ।

(১৪) খেয়াল এবং ধ্রুপদের অন্তর্বর্তী ঘরানা।
সৃষ্টিকর্তা—মথুরার ব্রাহ্মণরা।

(১৫) সরোদ ঘরানা।
সৃষ্টিকর্তা—নিয়ামতুল্লা খাঁ।

তানসেনের মৃত্যুর পর সেনী ঘরানার সৃষ্টি হয়। এর তিনটি শাখা—

(১) প্রথম শাখাটি সৃষ্টি করেন তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ। এই ঘরানার গায়কদের গৌড়বাণী ধ্রুপদের গায়ক বলা হয়।

(২) দ্বিতীয় শাখাটি সৃষ্টি করেন তানসেনের আর একটি পুত্র সুরত সেন। এই ঘরানার গায়কদের ডাগরবাণী ধ্রুপদের গায়ক বলা হয়।

(৩) তৃতীয় শাখাটির সৃষ্টি হয় তানসেনের জামাতা মিশ্রী সিং-এর থেকে। তাঁর বংশধরেরা ডাগরবাণী এবং খান্ডারবাণী এই দুই শ্রেণীর ধ্রুপদই পরিবেশন করতেন।

সেনী ঘরানার একটি শাখার স্রষ্টা বিলাস খাঁ। এই বিলাস খাঁ-এর পৌত্র ছিলেন করিম সেন। তাঁর দুই পুত্র। সুধর খাঁ ও রাজরস খাঁ। সুধর খাঁর পুত্র হাসান খাঁ ও তাঁর পুত্র গোলাপ খাঁ ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। গোলাপ খাঁর তিন পুত্র। হজর্ খাঁ, জ্ঞান খাঁ, জীবন খাঁ। তাঁদের মধ্যে হজর্ খাঁ ছিলেন রবাব যন্ত্রে পারদর্শী, আর অপর দুজন ধ্রুপদী। দিল্লীর দরবারের শেষ সংগীতজ্ঞ বলতে এঁদের বোঝায়।

হজর্ খাঁর তিন পুত্র ছিল জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এবং বাসৎ খাঁ। এদের 'ত্রিরত্ন' বলা হোত। সেই সময় গীত এবং বাদ্যে তাঁরা সবার শীর্ষে ছিলেন। কলকাতার রাজা হরকুমার ঠাকুর বাসৎ খাঁকে সংগীত নায়ক উপাধি দান করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্যার খাঁ ছিলেন উঁচুদরের সংগীত স্রষ্টা। তিনি তিলোক কামোদ রাগটির সৃষ্টি করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহম্মদ খাঁ কাওয়ালের নাম করা যায়। তিনি সদারংগের শিষ্যবংশীয় ছিলেন। তিনি খেয়ালের মধ্যে বিলম্বিত, গমক ও অলংকার দিয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেন।

রাগাশ্রিত বাংলা গানে উপরোক্ত ১৫টি ঘরানার প্রভাব কিছু না কিছু পড়েছে। কেননা বাঙালী বহু সংগীতজ্ঞ ভারতের বিভিন্ন ঘরানায় তালিমপ্রাপ্ত। তাঁদের সৃষ্ট রাগাশ্রিত বাংলা গানের গায়কী ঐ সব ঘরানা থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি 'মুক্তাবলী' নামে একটি নাটিকা প্রণয়ন করেন। দেশীয় সংগীতের উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি 'বেঙ্গল একাডেমী অব মিউজিক' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধি লাভ করেন।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন আলি মহম্মদ খাঁর শিষ্য। তিনি কাশীতে এবং কলকাতায় এঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রথম দেশী স্বরলিপি পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে কলকাতা রঙ্গালয়ে প্রথম দেশী রাগিণীতে ঐকতান সংগীত শুরু হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপেশ্বর বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন 'সংগীত কেশরী' অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়। তিনি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি টপ্পা এই সব কয়টি বিভাগেই তাঁর সমান দখল ছিল। বর্ধমানের মহারাজার রাজ-সভায় গোপেশ্বর ২৯ বৎসর ধরে সভাগায়ক ছিলেন। ১৩১৬ সালে তিনি 'সংগীত চন্দ্রিকা' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ১৩২১ সালে এর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই সময় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে 'সংগীত নায়ক' উপাধি' দান করেন।

তাঁর উদ্যোগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতকে শিক্ষার অন্যতম বিষয় বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষার পাঠক্রম এসেছে। তিনি ভারত পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন। সারা ভারতে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৯ সালে বেনারাস নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি ধ্রুপদ পরিবেশন করেন। তাঁর গান খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী থেকে তাঁকে 'স্বর-সরস্বতী' উপাধি দান করেন।

তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের উপর অনেকগুলি অমূল্য পুস্তক রচনা করে গেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, গীত প্রবেশিকা, গীত দর্পণ, বহুভাষা গীতি, তান-মালা, গীতমালা, গীত লহরী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

তিনি 'রামশরণ মিউজিক কলেজ'-এ সংগীত শিক্ষাদান করতেন। তিনি প্রায় ৫ হাজার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা আয়ত্ত করেছিলেন। সংগীত শাস্ত্রে তাঁর দান ছিল অমূল্য।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) ত্রিপুরা জেলায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সদু খাঁ। তিনি কঠোর সাধনার ফলে সঙ্গীত জগতে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে উঠেছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' খেতাব পান এবং সেই সঙ্গে পেলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তিনি উদয়শংকরের দলের সংগে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেছেন। তাঁর মধ্যে বহুগুণের সমাবেশ ঘটেছিল।

তিনি হারু দত্ত, নুলো গোপাল, আহমেদ আলী খাঁ এবং তানসেন বংশীয় উজীর খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি গিরিশচন্দ্র পরিচালিত মিনার্ভায় মাসিক ১২ টাকা বেতনে এক বাদকের চাকরী করতেন। দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম করে তাঁর সংগীত শিক্ষার জীবন কেটেছিল।

তিনি সরোদ, সুরবাহার, সেতার, বাঁশী, ক্ল্যারিওনেট, বেহালা, পাখোয়াজ, সানাই, তবলা, সুরশৃংগার, খোল, ঢোল—এই বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। এই একই শিল্পীর মধ্যে এরকম বহুগুণের সমাবেশ আমরা আর কারও মধ্যে পাই না।

বাঙালী এই সঙ্গীত সাধক নিঃসন্দেহে বাংলার গৌরব।

কালী মীর্জা

কালী মীর্জার আসল নাম 'কালিদাস'। তাঁর প্রকৃত নাম নিয়ে অবশ্য মতানৈক্য আছে। তাঁর পদবী নিয়েও মতানৈক্য দেখা যায়। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পদবী মুখোপাধ্যায় না চট্টোপাধ্যায় এই নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। 'বঙ্গের কবিতা' নামক পুস্তকে এবং সুবল মিত্রের অভিধানে—এই দুটি বইতেই আমরা দেখি তাঁর পদবী ছিল চট্টোপাধ্যায়। সম্ভবতঃ তিনি চট্টোপাধ্যায় বংশেরই ছিলেন। তিনি দিল্লী, কাশী, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি কিছু গানও রচনা করে গেছেন। তিনি সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঘুরে তিনি দেশে ফিরে এলে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে 'মীর্জা' উপাধি দেন। টপ্-খেয়াল ও টপ্পার অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন তিনি।

শ্রীধর কথক

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ায় শ্রীধর কথকের জন্ম হয়। তিনি কথক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশে তিনি টপ্পা গানের ব্যাপক প্রচার করেন। তিনি বন্ধুদের নিয়ে কবি ও পাঁচালীর দল গড়ে গান গাইতে শুরু করেন। সেইজন্য কবি ও পাঁচালীর দলের সংগে তাঁর যোগাযোগ বেশী ছিল। বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের কাছে তিনি কথকতা শেখেন। এই কথকতার জন্য তিনি নানা ভাবের ও নানা সুরের বাংলা গান রচনা করতেন। বাংলা ছাড়াও তিনি

আরবী, ফার্সী ও হিন্দীতে বহু গান রচনা করে গেছেন। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই সংগীত রচনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা দেখা যায়।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী ১৮৮৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ভবানীকিশোর চক্রবর্তী।

গিরিজাশংকর গর্ভণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অংকন শিক্ষা করেন। এখানে তাঁর অনেক তৈলচিত্র, জল রঙের ছবি আছে।

উচ্চাংগ সংগীতে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। ১৮ বৎসর বয়স থেকে তিনি সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। তিনি অনেক বড় বড় সংগীতজ্ঞের কাছে সংগীত শিক্ষা করেছেন। তিনি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যালয়ে প্রায় ৮ বৎসর রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। ওস্তাদ মুন্নে খাঁর কাছে খেয়াল শিক্ষা করেন।

ঠুংরিতে তিনি খুব সুন্দর উদু উচ্চারণ করতেন। কারণ তিনি এক মৌলবীর কাছে উদু শিক্ষা করেছিলেন। এর পর তিনি গোয়ালিয়রের ঠুংরি গায়ক ভাইয়া সাহেব, গণপৎ রাও এবং মৌজুদ্দিন-এর কাছে ঠুংরি শিক্ষা করেন। দিল্লীতে মুজফ্ফর খাঁর কাছে খেয়ালের তালিম নেন এবং ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ এবং উজীর খাঁর কাছে ধ্রুপদের তালিম নেন।

ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরি—এই তিনটিতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। এর মধ্যে ঠুংরি তিনি অসাধারণ গাইতেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি সংগীত শিক্ষা করে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। বহু রাগাশ্রিত বাংলা গান রচনা করেন। বিখ্যাত খেয়াল গায়ক তারাপদ চক্রবর্তী তাঁর শিষ্য ছিলেন। সুখেন্দু গোস্বামীও তাঁর নিকট খেয়াল শিক্ষা করেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঠুংরি

'যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে গাওয়া হয় এবং আধা কাওয়ালী এবং ঠুংরি তালে পরিবেশন করা হয় তাকে ঠুংরি বলে'। [গীত সূত্রধার] সকল রাগেই ঠুংরি গাওয়া যায় না। বিশেষ কয়েকটি রাগে ঠুংরি গান করা হয়। সাধারণ ২টি অংগে ঠুংরি শোনা যায়—পূর্বী ও পাঞ্জাবী। লক্ষ্মৌ এবং বারাণসীর ঠুংরি প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত। পাঞ্জাব অঞ্চলের ঠুংরি দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত।

সাধারণতঃ বিশেষ কয়েকটি রাগে ঠুংরি গাওয়া হয়। যেমন—ভৈরবী, খাম্বাজ, কাফী, তিলং, তিলক কামোদ, পিলু ইত্যাদি। বিশেষ কয়েকটি তালে যেমন, দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল, আদ্ধা, দীপচন্দী, যৎ ইত্যাদিতে এই ঠুংরি গাওয়া হয়ে থাকে। ঠুংরির বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম বা বিরহ নিয়ে হয়ে থাকে এবং এই

গান শৃংগার প্রধান ! অতুলপ্রসাদ সেন ঠুংরির প্রভাবে বাংলা গান রচনা করেন। তারপর নজরুল ইসলামও তাঁর বহু গানে ঠুংরির চাল এনেছেন। তাছাড়া ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী ও সুধীরলাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে পরিবেশিত ও সুরারোপিত বহু ঠুংরি চালের গান বাংলা সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও ঠুংরি অংগের কিছু গান রচনা করে বাংলা সংগীতের ভাণ্ডারে সংযোজন করেছেন।

ওয়াজেদ আলী শাহ

ওয়াজেদ আলী শাহ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল লক্ষ্ণৌ। তিনি অভিনব ঠুংরি রীতির প্রবর্তক ছিলেন। জাফর খাঁ, প্যারে খাঁ ও বাসৎ খাঁ এই তিন ভাইকে নবাব লক্ষ্ণৌ দরবারে স্থান দেন। বিলাস খাঁর বংশধর এই তিন ভাই ধ্রুপদ ও রবাব যন্ত্রে তখন শীর্ষস্থানে ছিলেন। এছাড়াও তাঁর দরবারে ছিলেন বীনকার গোলাম মহম্মদ খাঁ, ওমরাহ খাঁ প্রভৃতি গায়কগণ এবং বৃন্দাদীন, বৃন্দাদীনের পিতা এবং বৃন্দাদীনের ভ্রাতা কলকা প্রভৃতি নৃত্যশিল্পীগণ। তিনি প্রায় ৬৪ খানা বই লেখেন। তিনি 'হুজনই আখতার' এই পুস্তকটি 'আখতার পিয়া' এই ছদ্মনামে লিখতেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী তাঁর বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ এনে তাঁকে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন। এর পর প্রায় ২ বছর তিনি এখানে দরবার বনান। বহু সংগীতজ্ঞ তাঁর দরবারে আসতেন।

বাঙালী সংগীতজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় (সেতার), বামাচরণ বন্দোপাধ্যায় (খেয়াল), যদু ভট্ট ও কেশবচন্দ্র মিত্র। তাছাড়া আরও অনেকে এই দরবারের সংগে যুক্ত ছিলেন। যেমন—লক্ষ্ণৌ-এর আহমদ খাঁ (টপ্পা ও খেয়াল), বসৎ খাঁ (ধ্রুপদ ও রবাব) মুরাদ আলী খাঁ (ধ্রুপদ ', ছোট মিঞা (খেয়াল), তাঁর পত্নী ছোট বিবি (তবলা বাদিকা) ও তাঁর পুত্র বাবু খাঁ (তবলিয়া), গোয়ালিয়রের তাজ খাঁ (ধ্রুপদ), আলি বক্স (ধ্রুপদ, খেয়াল, ধামার), পাঞ্জাবের মুবারক আলি খাঁ ও রামপুরের সাদিক আলি খাঁ ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বাংলায় ওয়াজেদ আলীর সংগীতে ঠুংরির অবদান অনস্বীকার্য্য।

ওয়াজেদ আলী শাহ নিজে অনেক ঠুংরি গান রচনা করেন। 'নীর ভরণ কৈসে যাঊ', 'বাবুল মেরা নৈহার ছুট যায়'—এই গান দুটি তাঁর বিখ্যাত গান। তিনি নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। তাঁর গানগুলি কাফী, খাম্বাজ, দেশ, পিলু প্রভৃতি রাগে গাওয়া হত। কলকাতায় ঠুমরী রীতির প্রচলনেও তাঁর অবদান আছে। এই সময়ের ঠুংরি চালের বাংলা গানে আলী সাহেবের প্রভাব অপরিসীম।

গণপৎ রাও

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গনপৎ রাও এর জন্ম। তিনি গোয়ালিয়র রাজবংশে জন্মেছিলেন। গণপৎ রাও লক্ষ্মৌ এর ওস্তাদদের কাছে ঠুংরি শিক্ষা করেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে হারমোনিয়ামে ঠুংরি বাজনা আরম্ভ করেন। তিনি আলাপ, অলংকার সবই হারমোনিয়ামে বাজিয়ে দেখাতেন। তিনি অনেক ঠুংরি রচনা করেছেন। 'সুখর পিরা' এই ছদ্মনামে তিনি ঠুংরি রচনা করেছেন। তিনি যে ঠুংরি রীতির প্রবর্তক তাকে লচাও ঠুংরি বলা হয়। তাঁর শিষ্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী এবং শ্যামলাল ক্ষেত্রী এই রীতির ঠুংরি গান গাইতেন। গিরিজাশংকর চক্রবর্তী তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করতেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী ঠুংরি গানে তালিম্ নিয়ে বাংলা গানে ঠুংরি প্রভাব এনে বাংলা গান রচনা করবার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন।

নিধুবাবু (রামনিধিগুপ্ত)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা গান বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় শোরী মিঞার টপ্পার রীতির দ্বারা।

টপ্পা হিন্দী শব্দ— যার অর্থ লাফিয়ে চলা। এটি গানের একটা বিশেষ রীতি। টপ্পা রীতির গান আদিতে পাঞ্জাবের উষ্ট্রচালকদের জাতীয় সংগীত ছিল। শোরী মিঞা নানা অলংকারে ভূষিত করে টপ্পা গানকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করেন।

শোরী মিঞার অনুসরণে নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত অসংখ্য বাংলা টপ্পা গান রচনা করেন। নিধুবাবু রচিত গানগুলি নিধুবাবুর টপ্পা নামে পরিচিত। নিধুবাবু বিভিন্ন হিন্দুস্থানী ওস্তাদের কাছে সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তাঁর ওস্তাদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি নিজেই বিভিন্ন রাগ রাগিণীর ওপর-বাংলা টপ্পা রচনা করেন। বাংলা টপ্পা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালের হলেও মনের দিক থেকে তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন। তাঁর গানের ভাষা ছিল অনেক আধুনিক ও সমৃদ্ধ। সরস শব্দসমষ্টি তাঁর গানের আকর্ষণীয়তাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছিল।

তাঁর গানগুলি অধিকাংশ প্রণয় বিষয়ক। সেগুলি শ্রোতার অন্তঃস্থলকে অনায়াসে স্পর্শ করত— যেমন— একটি গান—"যার তরে মন দিতে বলগো
নয়ন আমার—"

অথবা, "ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে।"

প্রেমবিষয়ক গান ছাড়াও তিনি স্বদেশী গান ও ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেন। তবে স্বদেশী গান তিনি একটি মাত্রই রচনা করেছিলেন। গানটি— "নানান দেশের নানান ভাষা"—"বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা"।

নিধিবাবুর কালে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাশাপাশি তাঁর রচিত গানগুলি বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বোধ হয় তদানীন্তনকালের সমাজে আধুনিক গান হিসাবে এগুলির একটি পৃথক আকর্ষণ ছিল। তার ওপর নিধুবাবুর গায়কীর বৈশিষ্ট্যে গানগুলি প্রাঞ্জল হয়ে উঠত। তাঁর গানের ছন্দের সরলতা এ যুগের গানে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এমন কি কোথাও কোথাও শুধু বাণীগুলিই উচ্চারিত হয়ে গেল এমন মনে হয়, অথচ ভিতরে ভিতরে একটা ছন্দ রয়ে গেছে।

এ যুগেও নিধুবাবুর গানের বিশেষ চল আছে। কিন্তু তাঁর গানের ধারাটিকে যাঁরা ধরে রেখেছেন তাঁদের ছাপিয়ে অন্য আরেকটি style বা রীতি এই গানে অনুপ্রবেশ করে টপ্পার স্বকীয়তা ক্ষুণ্ণ করেছে। আজ টপ্পা নামধারী এক ধরনের লঘু সংগীত শ্রোতার মন জয় করছে যা আদৌ টপ্পা রীতিই নয়। এইভাবে টপ্পা গান ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ও পেয়েছে ও সার্বিক পর্যায়ে আসন করে নিতে চলেছে। কিন্তু এই সঙ্গীতকে সার্বিক করতে গিয়ে তার আপন বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে—এটা কখনই কাম্য নয়।

নিধুবাবুর জীবনী

রামনিধি গুপ্ত ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেনীর নিকট চাঁপাতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবু নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত।

বিবাহের পর ছাপরা জেলায় চলে যান নিধুবাবু। এখানে এক হিন্দুস্থানী ওস্তাদের কাছে তিনি টপ্পা গান শিক্ষা করেন। তারপর নিজেই তিনি বাংলা টপ্পা রচনা করেন। হিন্দী গানের রাগ এবং তাল অনুযায়ী তাঁর বাংলা টপ্পা রচিত। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম 'গীতরত্ন'। তিনি যে সকল টপ্পা রচনা করে গেছেন সেগুলি 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে প্রচলিত। তাঁর ভাষা ও পদ্ধতি ছিল অনেক আধুনিক।

কেউ কেউ বলেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর গানের যোগাযোগ ছিল। শোনা যায়, 'তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ'—এই গানটি নাকি তাঁর স্ত্রীর অভিমান ভঞ্জনের জন্য লেখা হয়েছিল। তাছাড়াও শ্রীমতী নামে একটি গণিকার অনুপ্রেরণায় তিনি অনেক গান রচনা করে গেছেন। প্রেম সংগীত ছাড়াও তিনি ব্রহ্মসংগীত রচনা করে গেছেন। ব্রাহ্মসমাজে উপাচার্য্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের নির্দেশে তিনি একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী

চর্যাপদের পথ ধরে বাংলা গান ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করলে বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন শিল্পী রাগভিত্তিক বাংলাগান পরিবেশনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই শিল্পীকুল বাংলায় মুল ঘরানা বিষ্ণুপুরের প্রভাবেই পরিপুষ্ট হন বলে জানা যায়। সেকালে ধ্রুপদের সগর্ব দাপট পাখোয়াজের গুরু গুরু ধ্বনির প্রতিধ্বনি

ঘোষিত হত বিষ্ণুপুরের আনাচে কানাচে। প্রায়ই শোনা যেত এই গুরুগম্ভীর আওয়াজের সমন্বয়ে সংগীতের সুরমূর্চ্ছণা। সেকালের বাংলাগানে তাই ধ্রুপদী আমেজের প্রভাব লক্ষণীয়।

তানসেনের ধ্রুপদের উত্তরাধিকারসূত্রে যাঁরা বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য ও ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বাংলা গানের প্রচার ও প্রসারের কাজে এই বিশিষ্ট শিল্পীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলা গানকে তাঁর গায়নশৈলীর চমৎকারিত্বে এক অপূর্ব নান্দনিক পর্যায়ে পর্যবসিত করেন। তাঁর নজরুল সংগীত খেয়াল ছাড়াও ধ্রুপদের প্রভাবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমন কি নজরুল সৃষ্ট—শ্যামাসংগীতেও তাঁর টপ্পা রীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

টপ্পা দানার সংগে বড় খেয়ালের তান প্রকরণ হুবহু মিলে যায়। বাংলা গানে করুণ রসের সংগে বীর-রসের সমন্বয় এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ গ্রহণে তৃপ্ত করে।

কালীপদ পাঠক

বিষ্ণুপুর ঘরানায় পরিপুষ্ট হয়ে বিভিন্ন বাঙালী গুণী শিল্পী বাংলাগানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর সমসাময়িককালের শিল্পী কালীপদ পাঠক এমন একজন ছিলেন। নিধুবাবুর টপ্পার ধারক বাহক হিসাবে কালীপদ পাঠকের নামটি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

কালীপদবাবুর সাংগীতিক দক্ষতা ও প্রতিভা অনুযায়ী তাঁর খ্যাতির প্রসার লাভ ঘটেনি। তিনি নিজেকে অনেকটা আড়ালে আড়ালে রেখে সংগীত সাধনা করে গেছেন। যথার্থ ভাবে বলতে গেলে তিনি ছিলেন একজন সংগীত সাধক। বাল্য-কালে পড়াশুনায় আগ্রহের প্রবণতা দিক পরিবর্তন করে সংগীতে বর্তায়। সংগীত ব্যতীত অপর কোন কিছুই তাঁর হৃদয়ে স্থান পেতনা। তিনি দিবারাত্র সংগীতেই মশগুল হয়ে থাকতেন। আত্মভোলা শিল্পী হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর কথায় ও কাজে একটি অদ্ভুত সামঞ্জস্য থাকতো। কখনো কোথাও কথার অন্যথা হয়নি। সংগীতের জন্য ইনি সকল কিছুকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করতেন না।

নিধুবাবুর টপ্পার ধারাটিকে যথাযথভাবে অক্ষুন্ন রেখে তিনি সংগীত পরিবেশন করতেন। তিনি টপ্পা গানই গাইতেন বেশী। এছাড়া খেয়াল ও ধ্রুপদেও পার-দর্শী ছিলেন। যদিও নির্দিষ্ট কয়েকটি রাগেই টপ্পা গান প্রচলিত, তথাপি বেহাগ, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগিণীতেও তিনি টপ্পা পরিবেশন করতেন। খাম্বাজ রাগে পর্যাপ্ত টপ্পা থাকলেও তিনি খাম্বাজ রাগের ওপরই ভিত্তি করে নানাবিধ সুরসৃষ্টিতে পারদর্শী ছিলেন। তাই তাঁকে খাম্বাজ-সিদ্ধ বলা হত। টপ্পা গানের ইতিহাসে কালীপদবাবু নিধুবাবুর ঘরানার ধারক হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর গানে টপ্পার দানাগুলি একটি বিশেষ রীতিতে স্বর সংগতির মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠতো। এই দানাগুলি

একটি বিশেষ সৌন্দর্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো ও টপ্পাগানের বৈশিষ্টকে ফুটিয়ে তুলতো। কিছু কিছু টপ্পায় আবার ঠুংরির স্টাইল সংযোজন করে তাকে একটি বিশেষ রূপে রূপায়িত করতেন। সেগুলি টপ-ঠুংরি নামে অভিহিত। টপ-ঠুংরিগুলি শ্রোতাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তুলতো ও তার অন্তর্নিহিত রসাস্বাদনে শ্রোতারা অসীম অনন্দে মেতে উঠতেন।

সেকালে বৈঠকী গানের আসরে টপ্পাগান একটি বিশেষ মর্যাদায় আদৃত হত। কালীপদবাবুর টপ্পায় ওস্তাদী থাকলেও গানের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। গানকে কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় সেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তাঁর গানের দানাগুলিও সুরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেত। দানাগুলি পৃথকভাবে অনুভূত হত না।

বর্তমানে কালীপদবাবুর গায়ন রীতির ধারক ও বাহক হিসাবে যে সব সংগীত শিল্পী বাংলা গানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করার জন্য একনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আছেন. চণ্ডীদাস মাল, রাজ্যেশ্বর মিত্র ও গোপাল চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়

সঙ্গীত জগতে কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বল নাম। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে বেলা থেকেই কৃষ্ণধনের সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। সরকারী চাকরী করতে করতেও তিনি সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত রাখেন। তাঁর রচিত 'গীত সূত্রসার' ভারতীয় সঙ্গীতের একটি উজ্জ্বল রত্ন। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ ও খেয়াল রচনা ও পরিবেশনের আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন কৃষ্ণধনবাবু।

চতুর্থ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকে বাংলা গানের নতুন যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হল। শুধু বাংলা গান নয়, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক সব দিকেই নতুন পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল। পাঁচালী, আখড়াই, খেউড়, কবিগান, লেটো প্রভৃতির সৃষ্টি হল। নতুন করে আবার যাত্রাগানের আসর বসতে শুরু করল। কারণ কর্মক্লান্ত বণিকেরা সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে এসে চিত্ত বিনোদন চাইত। সেইজন্য যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর তাদের ছিল না।

যাত্রা

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে যাত্রা চলে আসছে। কোন রাজকীয় সমারোহে শোভাযাত্রা কিংবা দেবপূজার উৎসব উপলক্ষ্য করে নাট্য-গীত অনুষ্ঠিত হত। এই নাট্য-গীতকেই 'যাত্রা' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া সাধারণ কোন উৎসব উপলক্ষ্য করেও যাত্রাগানের অনুষ্ঠান করা হোত। পাত্রপাত্রীরা যে সমস্ত আবৃত্তি বা গান করতো তা তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়েই করত। কোন কোন সময় এই গান নির্দিষ্ট করা থাকত। সংলাপ নটেরা মুখে মুখেই তৈরী করত। বাংলাতে ও ব্রজবুলিতে লেখা এই গান বেশীরভাগই অক্ষত রয়ে গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যে সকল যাত্রার সৃষ্টি হল সেগুলো হল পাঁচালী থেকে। পাঁচালীতে মূল গায়ক মাত্র একজন থাকে। কিন্তু যাত্রায় একাধিক গায়ক থাকে। এইহল পাঁচালীর সঙ্গে যাত্রার তফাৎ। যাত্রায় সাধারণতঃ তিনটি গায়ক থাকে। এই সময় কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা প্রচলিত ছিল। যাত্রায় আবার কৌতুকরসও দেখা গেল। কৃষ্ণযাত্রায় আমরা এই কৌতুকরস দেখতে পাই। এই যাত্রায় নারদমুনি এবং তার চেলা ব্যাসদেবের সংলাপে সাধারণ শ্রোতারা খুব কৌতুক অনুভব করতো। এতে আমরা ভক্তিরসও অধিক পরিমাণে দেখতে পাই। আধুনিক কালে আমরা যতগুলো যাত্রা দেখতে পাই তার মধ্যে এই কৃষ্ণযাত্রা সবথেকে প্রাচীন। দীনেশ চন্দ্র সেন এই কৃষ্ণযাত্রা সম্বন্ধে বলেছেন যে 'এই যাত্রার সাধারণ নাম ছিল কালীয়দমন'। শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলাই আমরা এই কালীয়দমন পালায় দেখতে পাই। কৃষ্ণযাত্রায় পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম ও সুবল বিশেষভাবে নাম করেন সেই সময়। পশ্চিমবঙ্গে এর প্রচলন দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। এরপর সৃষ্টি হয় বাঁধা যাত্রা পালা। পশ্চিমবঙ্গের গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এবং মধ্য বঙ্গের কৃষ্ণকমল গোস্বামী বাঁধা যাত্রা পালায় খুব নাম করেন

এই শতকের প্রথম দিকেই প্রাচীন যাত্রার সংস্কার ক'রে নতুন যাত্রার প্রচলন করেন শিশুরাম অধিকারী। তিনি কেঁদেলি গ্রামে বাস করতেন। 'অক্রুর সংবাদ', 'নিমাই সন্ন্যাস' গেয়ে পরমানন্দ অধিকারী এবং শ্রীদাম ও সুবল অধিকারী খুব নাম করেন। তাঁরা বীরভূমে থাকতেন। এছাড়া পিতাম্বর অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, লোচন অধিকারী এঁদের নামও করা যায়। এরপর রামযাত্রায় নাম করেন পাতাইহাটের আনন্দ অধিকারী, জয়চন্দ অধিকারী এবং প্রেমচাঁদ অধিকারী।

বর্ধমান নিবাসী লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাইতেন এবং ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ 'চণ্ডীযাত্রা' পালা গাইতেন। কলকাতায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রচলন দেখা যায়। এর অধিকারী ছিলেন গোপাল উড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতা শহরে যাত্রাগান ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ শিক্ষিত লোকদের রুচি পরিবর্তন। সেই সময় একটি নূতন যাত্রা পদ্ধতি আমরা দেখতে পাই। সেটির নাম "গীতাভিনয়"। সাধারণতঃ ভক্তিরসপূর্ণ গান আমরা এতে দেখতে পাই।

কবিগান—

সাধারণতঃ কবিগান লোকের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নিয়ে গান শুরু হয়। এতে দুটি দল থাকে। কোন একটি বিষয় নিয়ে প্রথম দল গাইত, দ্বিতীয় দল তার উত্তরে গান রচনা করে গাইত। সভাস্থলে দাঁড়িয়ে তাদের এই গান রচনা করতে হত। পরে দুই দলের দলপতি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গাইত। একে 'চাপান' ও 'উতোর' বলা হত। তবে গানের থেকে ব্যক্তিগত গালাগালি বেশী থাকতো। এতে শ্রোতারাও উৎসাহ দিত। এখনকার দিনে রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও এই কবিগান রচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কবিওয়ালা বলে যারা বিখ্যাত ছিলেন তাঁরা হলেন রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, সাধু রায়, নিতাই বৈষ্ণব ইত্যাদি। এদের মধ্যে হরু ঠাকুর বিরহ সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এই কবিওয়ালারা গুরুর কাছে শিক্ষা নিতেন। তাঁদের শাস্ত্রেও জ্ঞান থাকতে হত, তাছাড়া নিজস্ব জ্ঞান এবং ভাষার চটকদারিতা না থাকলে আসর জমাতে পারতেন না।

এন্টনি ফিরিঙ্গির নাম খুব বিখ্যাত ছিল সেই সময়ে। তিনি জাতিতে পর্তুগীজ ছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষা খুব জানতেন। সেইজন্য বাংলায় তিনি কবিগান ভালভাবে গাইতে পারতেন। দেবদেবীর উপরে তাঁর খুব ভক্তি ছিল।

রামচন্দ্র বসু—

১৭৮৬ সালে রামচন্দ্র বসুর জন্ম হয়। হাওড়ার নিকট শালিখায় তিনি বাস করতেন। তিনি পাঠশালায় বসে বসে গান লিখতেন। এতে আমরা বুঝতে পারি বাল্যকাল থেকেই তাঁর সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল এবং তাঁর রচনাশক্তিও ছিল।

রাম বসু কবিওয়ালা ভবানী বেনের কবিদলের সংগীত রচয়িতা ছিলেন। মোহন সরকার, নীলু ঠাকুর এদের দলেও তিনি গান বাঁধেন। তাঁর গানের ভাষা ছিল খুব সহজ। তিনি বিরহ-বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে করতে পারতেন। রামবসু কবির লড়াই এর প্রথা প্রচলন করেন। দূর দূরান্তে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কাশীমবাজার রাজবাড়ীতে গাইতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপরই ১০২৮ সালে তিনি মারা যান।

হরু ঠাকুর

হরু ঠাকুর ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র। তার প্রকৃত নাম ছিলো হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ছোট বয়স থেকেই তাঁর কবিতা রচনা করা এবং গান করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। তাঁর গুরুর নাম ছিল রঘুনাথ দাস কবিওয়ালা। তিনি নিজে কোন কোন গানে গুরুর নামে ভনিতা লিখেছেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে একবার তিনি তাঁর দল নিয়ে গাইতে গেছিলেন। মহারাজা তাঁর গানে খুশী হয়ে একজোড়া শাল পারিতোষিক দিয়েছিলেন। তাঁর কবি গানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাঁর গানে আমরা তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কিছু গান সংগ্রহ করেন। ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঁচালী

পাঁচালি গান ছিলো অনেকটা আবৃত্তির মতো। পাঁচজন চামর হাতে দাঁড়িয়ে এই গান গাইতো। এটি ছিলো নানা ছন্দে গাথা কাব্য। একে পাঁচালী গান বলা হতো। কৃত্তিবাসের রামায়ণকেও পাঁচালী বলা হতো। এই গান যারা গাইতো তাদের হাতে চামর ও মন্দিরা থাকতো এবং পায়ে নূপুর থাকতো। এই পাঁচালী গানের কবিরা খুব যে শিক্ষিত ছিলো তা নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এর রূপান্তর শুরু হলো। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাড়াও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল সব কাব্যই পাঁচালী ছিলো।

পাঁচালী গান ছিলো অনেকটা কবি গানের মতই। উভয় গানই পালা বেধে গাওয়া হতো। উভয় গানেই পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ ছিলো। তবুও আমরা এই দুই ধরনের গানে বিশেষ প্রভেদ দেখতে পাই। কবি গান রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘটনা অনুযায়ী রচিত হতো। কিন্তু পাঁচালী গান তেমন ছিলো না। পাঁচালী গান যারা গাইতো তারা আগে থেকেই পালা বেঁধে নিয়ে আসতো। পাঁচালী কিংবা কবি গান যারা গাইতো তাদের প্রত্যেকেরই উপস্থিত বুদ্ধি থাকবার প্রয়োজন ছিলো।

প্রথমতঃ শাস্ত্র বিষয়ক কথাবার্তা নিয়েই পালা আরম্ভ হতো, কিন্তু প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্য উভয় পক্ষই অশ্লীল গালাগালি দিতো। কিন্তু তখনকার দিনে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এইসব পালা উপভোগ করতেন।

বর্তমানে এই পাঁচালী গানের প্রতি সাধারণ লোকের সেইরকম কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। ৩০।৪০ বছর আগেও এই গানের বিশেষ সমাদর ছিলো। এখন 'মেলা-বাজারে' মাঝে মাঝে এই গান শুনতে পাওয়া যায়। পাঁচালী গানের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দাশরথি রায়। তবে সন্ন্যাসী চক্রবর্তী, ঠাকুরদাস দত্ত, ব্রজনাথ রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বারিকানাথ অধিকারী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস ও গঙ্গানারায়ন নস্কর সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

দাশরথি রায়

দাশরথি রায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঁচালী রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে তিনি পিলা গ্রামের অক্ষয়া পাটনী নামে এক মেয়ে কবির দলে যোগ দেন। এই দলে তিনি ছড়া বাঁধতেন এবং কবিগান গাইতেন। পরে তিনি ঐ দল ছেড়ে দিয়ে কয়েকজনকে নিয়ে একটি পাঁচালীদল গঠন করেন। এই পাঁচালী গান গেয়ে তিনি বহু অর্থ উপার্জনও করেন। ধীরে ধীরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

তাঁর গান যেই শুনতো সেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। তাঁর শব্দ চয়নে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখা গিয়েছিলো। তাঁর পাঁচালীতে করুণ, ভক্তি, হাস্য প্রভৃতি বিচিত্র রসের সমাবেশ দেখা দিয়েছিলো। তাঁর পাঁচালী 'দাশুরায়ের পাঁচালী' নামে বিখ্যাত ছিলো। এই পাঁচালী শোনার জন্য লোকেরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতো। তিনি অনেক ভক্তিরসাত্মক গীত রচনা করেছেন। আবার অনেক বিদ্রুপাত্মক সঙ্গীতও রচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন—"আমাদিগকে দিতে নাগর, এলেন গুণের বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর বিধবা পার কর্তে তরীর গুণ ধরেছে গুণনিধি"।

তাঁর রচনায় আমরা প্রচুর অলংকারের প্রয়োগ দেখতে পাই। তাঁর রচিত ৬০টি পাঁচালীর পালা আছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আর্যা

এক ধরনের হেঁয়ালি ছড়া। এই ছড়া সাধারণতঃ প্রাকৃতের আর্যা ছন্দে লেখা হতো। সেজন্য এর নাম হয়েছে আর্যা। এই ছড়ায় উত্তর প্রত্যুত্তর থাকতো। জনসাধারণ এতে খুব আনন্দও পেতো।

তরজা

ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা তরজার প্রচলন দেখতে পাই। সাধারণতঃ এটি ভক্তিমূলক গান, তবে উনবিংশ শতকে এর কিছু পরিবর্তন হয়। এখন খাঁটি লৌকিক বিষয়ে তরজা গাওয়া হয়।

খেউড়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শান্তিপুরে আমরা খেউড় গানের প্রচলন দেখতে পাই। এটি গ্রাম্য ভাষায় রচনা করা হতো। আদি রসাত্মক কাহিনী নিয়ে টপ্পার সুরে এই গান গাওয়া হতো। একে খেড়ু বা খেউড় বলা হতো। এই গান সাধারণতঃ কাহিনীমূলক ছিলো। প্রথমে নদীয়া জেলায় পরে চুঁচুড়া এবং কলকাতায় এর প্রচলন হয়।

আখড়াই

উনবিংশ শতাব্দীতে খেউড়ের সংস্কার করে আখড়াই গানের সৃষ্টি হয়। রাজা নবকৃষ্ণের সভাসদ কুলুইচন্দ্র সেন এই খেউড়ের সংস্কার করেন। এই আখড়াই আড্ডা ঘরের উপযোগী। এতে বিভিন্ন রাগরাগিণীর সন্নিবেশ থাকতো। এতেও দুটি দল অংশগ্রহণ করতো। দু দলই গান করতো। তবে এতে কোনো উত্তর প্রত্যুত্তর ছিলো না। যে দলের গান ভালো হতো তারাই জয়ী হতো। রামপ্রসাদ ঠাকুর, শ্রীদাম দাস, নসীরাম সেকরা এই গানে খ্যাতি লাভ করেন।

হাফ্ আখড়াই

আখড়াই এর পর হাফ আখড়াইএর সৃষ্টি হয়। আখড়াই গান ভেঙ্গে-এর সৃষ্টি হয়। এটি আখড়াই-এর থেকে একটু আলাদা ছিলো। এতে উত্তর প্রত্যুত্তর ছিলো। নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদবাবু এর উদ্ভাবন করেন। এই গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ খুব কমই করা হতো। এর রীতি খুব সহজ ছিলো।

নেটো

প্রাচীন 'নাটুয়া' থেকে নেটো বা লেটো গানের সৃষ্টি। এটি নাচ-গান-অভিনয় সমৃদ্ধ ছিলো, এক সময় পশ্চিমবঙ্গে এর চল দেখা যায়, কিন্তু বর্তমানে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ঝুমুর

পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি ছোটনাগপুরের পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের যে লৌকিক পদাবলী গাওয়া হয় সেটি ঝুমুর নামে পরিচিত। এই গান বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে গাওয়া হয়। ঝুমুর গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের কথা বা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী দেখতে পাই। এর অভিনেতার সংখ্যা তিনের বেশী হতো না। সাঁওতালি এবং বাংলা এই উভয় ভাষাতেই রচিত গান দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলিকে বলা হয় সাঁওতালি ঝুমুর।

টপ্পা

টপ্পার আদি অর্থ 'লম্ফ'। এটি হিন্দি শব্দ। ধ্রুপদ এবং খেয়াল থেকে এই গান সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সেইজন্য এর নাম টপ্পা।

এই গানে মাত্র ২টি বিভাগ থেকে—স্থায়ী ও অন্তরা। এই গানের বাণীতে পাঞ্জাবী ভাষার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। এতে দানাদার বোলতানের আধিক্য অধিক। এর প্রকৃতিও চঞ্চল। একাধিক তালে টপ্পা গাওয়া হয়। খাম্বাজ, ভৈরবী, চৈতাগোরী, দেশ, সিন্ধু, কালেংড়া প্রভৃতি রাগ রাগিণীতে টপ্পা গাওয়া হয়। এছাড়া টপ্পা গানে কয়েকটি আধুনিক রাগ ব্যবহার করা হয়। যেমন—কাফী, ঝিঁঝোটী, পিলু, সাঁঝি, লুম, বারোঁয়া, ইমানি ইত্যাদি। টপ্পা গান আগে পাঞ্জাবে উষ্ট্রচালকদের জাতীয় সঙ্গীত ছিলো। প্রসিদ্ধ গায়ক শোরী মিঞা তাকে উন্নত করে তুলেছিলেন। সাধারণ লোকের কণ্ঠে এই গান ধ্বনিত হতো।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান

বাংলা গানের জগতে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি অবিস্মরণীয় নাম। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরে মহারাজার দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৮৮৪ খ্রীঃ এম. এ পাশ করে সরকারী বৃত্তি নিয়ে তিনি কৃষিবিদ্যা শিখতে ইংলণ্ড যান। সেখান থেকে ফিরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই মে তিনি পরলোকগমন করেন।

সরকারী কাজে থাকাকালীন দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 'ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিজেন্দ্রলালের গানও বেশীর ভাগ নাটকের তাগিদে লেখা। নাটক লিখতে তিনি ঐ সব গান লেখেন। ঐতিহাসিক নাটক মেবার পতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত সোহরাবরুস্তম, নূরজাহান, রাণাপ্রতাপ, তারাবাঈ ইত্যাদি নাটকে বহু সুন্দর সুন্দর গান রচনা করেন এবং সেগুলি বাংলা সঙ্গীতের ভাণ্ডারের এক একটি রত্ন। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রাহস্পর্শ, পুনর্জন্ম ও পরপারেও চমৎকার সব গান আছে।

নাটকের গান বাদ দিলেও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও স্বদেশী গানগুলিরও সত্ত্বা আছে—যার জন্য এখনও সেগুলি বাঙালীর মুখে মুখে ফেরে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গীতরচনায় ও সুরসংযোজনায় সার্থকতা লাভ করেছেন। তাঁর বেশ কিছু গান কথা ও সুরের আলাদা বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। বিশেষ করে তাঁর জাতীয়তামূলক গানগুলি সুরের আলাদা কাঠামোয়

রচিত। বাংলা গানে বিদেশী সুরের হারমোনাইজেশন বা সুরসংগতির পথিকৃত দ্বিজেন্দ্রলাল একথা বললে অত্যুক্তি হবে না বলে আমার মনে হয়। হারমোনাইজেশনের এই নূতন রীতি প্রয়োগ ক'রে দেশাত্মবোধক গানে দ্বিজেন্দ্রলাল এক যুগান্তকারী রূপ দিয়েছেন বাংলা গানে। তাঁর রচিত 'ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা,' 'ভারত আমার ভারত আমার,' 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'সেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানগুলির সুর বিশ্লেষণ করলেই তাঁর হারমোনাইজেশনের রীতিটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। রাগ-সঙ্গীতের কাঠামোয় গানগুলি রচিত হলেও সুরসংগতির দরুন দ্বিজেন্দ্রলালের উক্ত দেশাত্মবোধক গানগুলি একটি নতুনরূপ নিয়েছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতন দ্বিজেন্দ্রগীতির খুব একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য বা ঢং নেই একথা সত্য—কারণ আঙ্গিকের দিকটি বেশী প্রাধান্য পেয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে। তাই সুরসৃষ্টিতে গভীরতা ও সূক্ষ্মতা এখানে গৌণ। এক কথায় বলা চলে যে দ্বিজেন্দ্রলালের সুর নাটকীয় প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক গানগুলি কথা প্রধান। এতে সুরের বৈচিত্র্যের অথবা মেলোডির বিশেষ কোন সুযোগ নেই। এতে সুর সংযোজনার পরিসর সীমিত। তাই এ গানগুলি ভঙ্গিপ্রধান—সহজ ও সরল সুরে বাঁধা। হাস্যরসাত্মক গানগুলি বিদ্রুপাত্মক—সুরের দিক থেকে না হলেও বাণীর দিক থেকে এর মূল্য অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু তার নাটকের জন্যই নয়, গানের জন্যও চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের যেমন মূল প্রবণতা ছিল ধ্রুপদী গানের দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমনি টপ্পা ও খেয়ালের দিকে।

পরিশেষে একথা বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর গানে আলাদা ঢং এর প্রচলন করলেন—যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়—তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক গানে দ্বিজেন্দ্রলালকে চিনতে ভুল হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম—১৮৬১ সালের ৭ই মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ছয় বছর বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হন; আট বছর বয়সেই স্কুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয় এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বোলপুরে চলে আসেন। সেখানে আবার স্কুলে ভর্ত্তি হন—কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে—তাই আবার স্কুলের পাঠ বন্ধ করে বাড়ীতেই লেখাপড়া করতে শুরু করেন। এরপর তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেতে কিছুদিন 'ইউনিভারসিটি কলেজে' অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের

কোন ডিগ্রী লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন শৈশবেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকে গান রচনা করেন। এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চন্দননগরের গঙ্গার ধারে বাগান বাড়ীতে কিছুদিন বাস করে সাহিত্য সাধনা করেন। এই সময়েই তাঁর সন্ধ্যাসংগীত লেখা হয়। সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হতেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তারপর রচিত হয় নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প। বিংশ শতাব্দী এলো। ১৯০১ খ্রীঃ তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমই আজকের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯০৫ সালে হয় বংগভংগ। এর প্রতিবাদে কবিগুরু লিখলেন বহুগান। ১৯১০ খ্রীঃ প্রকাশিত হল গীতাঞ্জলি—গীতাঞ্জলি লিখেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন।

বৃটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন ও জনসভা হয়। সেই জনসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ এবং তারই রচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি পরিবেশিত হয়। ১৯১৯ এ ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে এলমহার্স্টের সহযোগিতায় তিনি শ্রীনিকেতন গড়লেন। সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞানীগুণী আসতে শুরু হয়।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের স্বপক্ষে বহু রচনা লেখেন।

১৯২৭-এ কবিগুরু পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করেন। তারপর আবার ইউরোপে। ফ্রান্সে হয় তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী।

তারপর জার্মানী হয়ে তিনি মস্কো যাত্রা করেন। 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হয় রাশিয়া থেকে ফিরে। ১৯৩১-এ আমেরিকা ঘুরে দেশে ফিরলেন তিনি। ১৯৩২ তিনি পারস্য ভ্রমণে যান। এরপর স্বদেশে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সিংহল পর্যন্ত গিয়ে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অভিভাষণ দেন। ১৯৩৯ শে নেতাজী, জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ কবির সংগে মিলিত হন। ১৯৪০ শে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৪১ শে রোগভোগের পর ৭ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সঙ্গীত রচনাবলী

সংগীতরচনাবলীর মধ্যে গীতবিতান, গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্য ভানুসিংহের পদাবলী, গীতিনাট্য—চিত্রাংগদা, শ্যামা, শাপমোচন, চণ্ডালিকা, বাল্মিকীপ্রতিভা, মায়ারখেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর গানগুলির স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক পরিবেশ

কবিগুরুর ঠাকুর পরিবার শিক্ষা, সংস্কৃতি সব দিক থেকে উন্নত ছিল—তাই কবিগুরুর শৈশবে সাংগীতিক পরিবেশের অভাব ঘটেনি। তাঁর দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট থেকে বাঁশী ও অর্গান শিক্ষা লাভ করেন তিনি। দাদা হেমেন্দ্রনাথও তানপুরা নিয়ে সারাদিন সংগীত সাধনায় রত থাকতেন। তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথও হিন্দুস্থানী সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। সোমেন্দ্রনাথও সঙ্গীতের আর একজন উপাসক। কবির ভগ্নিপতি সারদাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ও একজন দক্ষ সেতারী ছিলেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উচ্চাংগ সগীতের ভক্তছিলেন। তাই পারিবারিক সংগীতের পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত-শিক্ষা ও সংগীত সৃষ্টি অব্যাহত থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের ধারা প্রবাহিত হয়েছে ঠাকুর বাড়ীতে। কবিগুরু তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"

ঠাকুরবাড়ীর এক কর্মচারী কিশোরী চাটুর্যের কাছে তিনি বহু পাঁচালীগান শেখেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছ থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নেন।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকুরবাড়ীতে গানের বহু আসর বসতো। সেই আসরে পরিবেশিত হ'ত ধ্রুপদ গান। বহু ওস্তাদদের রাগরাগিণীর আলাপ, মূর্ছনা কবিগুরুর মনে ভেসে বেড়াত। কবিগুরু নিজেই বলেছেন, "ছেলেবেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়। তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল।"

একটু বড় হলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধ্রুপদী গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর সংগীত স্রষ্টা যদুভট্টের কাছে তিনি সংগীতের তালিম নেন। এই যদুভট্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, "তাঁর মত ওস্তাদ বাংলা দেশে জন্মায় নি।"

বাইশ-তেইশ বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাম সুগায়ক, সুরকার ও গীতিকার-রূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গায়ক ও গীতিকাররূপে কবিগুরুর স্বীকৃতি হয় "সংগীত মুক্তাবলী"তে।

রবীন্দ্রনাথ ষোল সতেরো বছর বয়স থেকেই নিজের গানে নিজে সুর দিতে আরম্ভ করেন। ঐ বয়সেই তিনি জ্যোতিন্দ্রনাথের 'পুরু বিক্রম' ও 'সরজিনী' নাটকের জন্য গান লেখেন। পুরুবিক্রমের জন্য লিখেছিলেন 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটিমন'। আর সরজিনী নাটকের জন্য লিখলেন—'জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ। "ভানুসিংহের পদাবলী"ও ঐ সময়ের রচনা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য

বাংলা গানে শুরু চর্য্যাপদের যুগ থেকে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙলায় কাব্য সঙ্গীতের ধারা পাশাপাশি বয়ে চলে। তাই চর্য্যাপদ, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণবপদাবলী, রামপ্রসাদী, টপ্পা, দাশুরায়ের পাঁচালী প্রভৃতি সঙ্গীত নিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলা কাব্য সঙ্গীতের দেহ। যদিও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দ্বারা পুষ্ট বাংলা সঙ্গীতের কলেবর, তবুও একথা বলা চলে যে বাংলা গান তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে তার গতিপ্রবাহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা গানের এই স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটল একে একে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সঙ্গীত সৃষ্টির মাধ্যমে। দ্বিজেন্দ্রলাল নতুন কিছু সৃষ্টি করলেন খেয়াল অঙ্গের—বাংলা গান রচনার ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের সুর সংহতির মাধ্যমে। অতুলপ্রসাদ—তার সঙ্গীত সৃষ্টিতে মেশালেন হিন্দি ঠুংরির সাথে বাংলা গানের ভাব মাধুর্য। রজনীকান্ত এই দুই স্রষ্টার মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করলেন। নজরুল ইসলাম বংলা গানে আনলেন পারসী গজলের রীতি। রাগ সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করলেন বিভিন্ন ধরনের কাব্যগীতি, বিদেশী সুরের কাঠামোয় বাধলেন বিচিত্র ধরনের গান আর সৃষ্টি করলেন বিদ্রোহ ও সাম্যবাদের গান। এর ফলে বাংলা গানের ভাণ্ডারের পরিব্যাপ্তি ঘটল। আর এই পরিব্যাপ্তির পূর্ণ রূপ নিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টিতে। ধ্রুপদ থেকে শুরু করে লোকসঙ্গীত ও কীর্তনের ধারা এসে মিশল কবিগুরুর অপূর্ব এই সঙ্গীত সৃষ্টিতে। ভারতীয় রাগরাগিণীর এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ—তিনি ঘটালেন রাগ বিবর্তন ও ছন্দ বিবর্তন। বিদেশী সুরের ধাঁচে স্বদেশী ছাঁচে তিনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সঙ্গীতকে ঢেলে সাজালেন এক নতুন সৃজনী কৌশলের মাধ্যমে। প্রেম, প্রকৃতি, ভক্তি, স্বাদেশিকতা সব কিছুরই রূপরসের আধার হয়ে উঠল রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সৃষ্টি করলেন আধুনিক গানের উৎস।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সনাতন পন্থীদের গোঁড়ামী ভেঙে নতুন সঙ্গীত শৈলীর প্রবর্তন করেন। এতদিনের সনাতন পন্থীদের অন্ধ সংস্কার বা গোঁড়ামী সঙ্গীত সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সেই গোঁড়ামীকে ভেঙ্গে দিলেন। অবশ্য তাঁর জন্য তাকে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়েছে পুরাতন পন্থীদের কাছ থেকে। তিনি নতুন পথের পথিক। তাই গতানুগতিক পথ থেকে নির্ভীক ভাবে সরে গিয়ে নতুন ঢঙে-এর সৃষ্টি করলেন তার গানে। দুই সহস্রের উপর তিনি সঙ্গীত রচনা করে বাঙলার সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত থেকে সম্পদ আহরণ করে বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে তিনি রচনা করলেন সঙ্গীত। এই সময় তাঁর সৃষ্টি "বাল্মিকী প্রতিভা" গীতিনাট্য। তাই জীবনস্মৃতিতে কবিগুরু নিজেই লিখেছেন এই দেশী ও বিলিতী সুরের চর্চায় বাল্মিকী প্রতিভার জন্ম হল। 'ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতি-নাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা' হইতে অন্যদিকে বাহির করিয়া আনা ইহয়াছে, উঁড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।' বাল্মকী প্রতিভার পর "মায়ার খেলা" ও "কালমৃগয়াতে"ও এই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের আর একটি সুর হচ্ছে কাব্যধর্মী গানের সুর। সে গানে প্রাধান্য পেয়েছে ভাব। তাই তিনি বলেছেন, "সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়। সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।" সত্যই এই যুগল মিলন ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ সুর ও বাণীর মধ্য দিয়ে তার গানে।

লোকসঙ্গীত বিশেষ করে বাউল—ভাটিয়ালী গান এবং কীর্তনের ধারা কবিগুরু তাঁর বেশীর ভাগ গানেতেই লাগিয়েছেন। "শ্যামা", "চিত্রাঙ্গদা"তে এবং অন্যান্য স্বদেশী গানও রচিত হয়েছে লোকসঙ্গীতের কাঠামোয়।

রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হবে না। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ রাগরাগিণীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন অর্থাৎ যেখানে কোনো রাগেতে শুদ্ধ ধৈবত আছে, কোমল নি-এর ব্যবহার নেই, সেইখানে তিনি কোমল নি ব্যবহার করে নতুন রসের সৃষ্টি করেছেন তাঁর গানে। কোনো সময় তিনি সকালের রাগিণী টোড়ীর সাথে গুণকেলী মিশিয়ে প্রাতঃকালীন এক নতুন রাগের সৃষ্টি করেছেন। এতে তাঁর গান আরও শ্রুতিমধুর হয়েছে সন্দেহ নেই।

ভারতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টারা মূল রাগরাগিণীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে কত নতুন রাগ-রাগিণীর নামকরণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ওইভাবে সূক্ষ্ম বিচার করলে এই কথাই বলা চলে যে কবিগুরু নিঃসন্দেহে বহু রাগরাগিণীর স্রষ্টা। তার নামকরণ করতে হলে বলতে হবে ঠাকুর টোড়ী, ঠাকুর ভৈরবী বা ঠাকুর পূরবী ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিককার গান ধ্রুপদ ভাঙা। তিনি ধ্রুপদ গানের বিপুলতা, গভীরতা গ্রহণ করেছেন তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টিতে। তাই তাঁর প্রথম যুগের গান ধ্রুপদী ঢঙের গান। ব্রহ্মসঙ্গীতের অধিকাংশ গানই ধ্রুপদাঙ্গের ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী প্রভাবিত। প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলি একটু লঘু চালের কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালীর সঙ্গে রাগ সঙ্গীতের সংমিশ্রণে সেই গানগুলি কবিগুরু কর্তৃক সুরারোপিত হয়েছে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ যে উপাসনা সঙ্গীতগুলি রচনা করেছেন সেগুলি উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঢঙে। রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ব্রহ্মসংগীতটি

হলো "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।" গানটি ধ্রুপদাঙ্গের। আগেই বলেছি যে কবিগুরু রচিত স্বদেশী গানগুলি বাউলাঙ্গের এবং কিছু কিছু গান বিদেশী সুরের কাঠামোয় রচিত।

সমগ্র রবীন্দ্র সংগীতকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায় সুরের চারিত্রিক কাঠামো দেখে। যথা—

(১) রাগাশ্রিত

রাগাশ্রিত গানগুলি ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল অঙ্গের। ধ্রুপদাঙ্গের গানের মধ্যে "তাহারে আরতি করে", কার মিলন চাও বিরহী, "প্রথম আদি তব শক্তি"। ধামার ঢঙের গানের মধ্যে আছে—"জাগো নাথ জ্যোৎস্না রাতে", "অমৃতের সাগরে"। খেয়াল অঙ্গের গানের মধ্যে আছে—"আঁখি জল মুছাইলে", "কোথা সে উধাও হইল"। টপ্পা অঙ্গের গানের মধ্যে আছে—"বাজে করুণ সুরে", "ব্যাকুল প্রাণ কোথা" ও "দিন যামিরে দিন"। ঠুংরি অঙ্গের গানের মধ্যে আছে—"ও যে মানে না মানা", "কি করিলি মোহের ছলনা।"

(২) আঞ্চলিক সঙ্গীত থেকে গৃহীত

ভারতের বহু প্রদেশের আঞ্চলিক সংগীত থেকে কবিগুরু সংগীত সংগ্রহ করে তাঁর গানে লাগিয়েছেন। যেমন—"নীলাঞ্জন ছায়া", (দক্ষিণ ভারত সংগীত থেকে) "বাজে বাজে রম্য বীণা", (পাঞ্জাবী সংগীত থেকে)। "নমি নমি ভারতী" (গুজরাতী সংগীত থেকে)।

(৩) লোকসঙ্গীতের প্রভাবে প্রভাবিত রবীন্দ্রসঙ্গীত

(ক) "আমার সোনার বাংলা" (বাউল গগন হরকরার "কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে" গানটির সুর অবলম্বনে)।

(খ) "গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ" (ভাটিয়ালী সুরে)।

(গ) "ভেঙে মোর ঘরের চাবি" (বাউল সংগীত—"দেখেছি রূপ সাগরে")।

(ঘ) "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে" (সারি গান—মন মাঝি তোর সামাল সামাল ডুবল তরী)। ইত্যাদি।

(৪) বিদেশী সঙ্গীতের অনুসরণে রচিত

"তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা"।

"পুরানো সেই দিনে কথা", (শুড ওল্ড অ্যাকোয়নটেন্স, বি ফরগট এ্যান্ড নেভার ব্রট টু মাইন্ড)।

"আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে" (ইউরোপীয় চার্চ সংগীত), ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত তাল

নবতাল—(৯ মাত্রা) "নিবিড় ঘন আঁধারে" ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট।

একাদশীতাল —(১১ মাত্রা) "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া" ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট।

নবপঞ্চতাল—(১৮ মাত্রা) "জননী তোমার করুণ চরণখানি" ইত্যাদি।

ঝম্পক—(৫ মাত্রা) "যেতে যেতে একলা পথে" ইত্যাদি।

এছাড়া কবিগুরু ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত চৌতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, সুর-ফাকতাল, যৎ, ত্রিতাল, মধ্যমান, আড়াঠেকা, দাদরা, কার্ফা, তেওড়া, রূপক প্রভৃতি বহু তালেই তিনি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। রামপ্রসাদী সুরেও তাঁর কিছু গান রচিত আছে।

রবীন্দ্র সমসাময়িক যত গীতিকার-সুরকার বাংলা গান রচনা করেছেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার-গীতিকার বলে স্বীকৃত। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল প্রভৃতি সকলেই মহান সঙ্গীত স্রষ্টা সন্দেহ নেই কিন্তু সুর ও বাণীর শ্রেষ্ঠতার শিখরে রবীন্দ্রনাথের নাম। কারণ একমাত্র তাঁর গানেই আমরা একটা নিজস্ব ঢঙ খুঁজে পাই এবং স্বকীয়তা অর্থাৎ "ট্রেড মার্ক" অন্য কারুর গানে রবীন্দ্রনাথের মত ফুটে উঠে নাই যাতে বিশেষ করে সেই গানকে চেনা যায়। ভাষা ছাড়াও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজালেও শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ডি. এল. রায়, অতুলপ্রসাদ বা নজরুলের গানে সেই রকম একটা "ট্রেড মার্ক" স্পষ্ট-ভাবে ধরা পড়ে না যাতে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম।

কাজী নজরুল ইসলামের গান

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকির আহম্মদ। মাতার নাম জাহেদা খাতুম। ছেলেবেলায় নজরুলের নাম ছিল দুঃখু মিয়া। কাজী সাহেব ছেলেবেলাতে তাঁর বাবা মাকে হারান এবং খুবই অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন।

কাজী সাহেব ধর্ম অনুরাগী ছিলেন শৈশব থেকে। তাঁর বাড়ীর দক্ষিণে একটি মসজিদ ছিল। কিছুদিন নজরুল ঐ মসজিদে এমামতিয়ো করেছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এগার বছর বয়সে কবি অর্থ উপার্জনের জন্য লেটোর দলে প্রবেশ করেন। এই

দল চুরুলিয়া ও বীরভূম অঞ্চলের গায়কদের নিয়ে গঠিত ছিল। কবি প্রথমে ঐ দলে গায়ক হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে দলের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। সংসারের অভাব অনটনের জন্য গ্রাম থেকে আসানসোলে গিয়ে রুটির দোকানে আট টাকা বেতনের চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানে আসানসোলের দারোগা রফিউদ্দিনের সংগে তাঁর পরিচয় হয়। দারোগা সাহেব নজরুলের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মৈমনসিংহে (অধুনা বাংলাদেশ) নিয়ে যান এবং দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করেন। সেখানে এক বছর পড়াশুনা করার পর নজরুল আবার ফিরে যান রাণীগঞ্জের সিয়াররোল রাজস্কুলে।

কবির বয়েস তখন সতের বছর। দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। কি করে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়া যায় তাই ছিল একমাত্র স্বপ্ন। নজরুল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী পল্টনে যোগদান করেন সেখান থেকে তাঁকে করাচীতে পাঠানো হয়। তিন বছর সৈন্যদলে কাজ করেন তিনি। সেই সময় থেকে তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সরকার তাকে সাব-রেজিস্ট্রারের পদে চাকরী দিতে চাওয়ায় নজরুল তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ সময় তিনি 'ধূমকেতু' নামে জ্বালাময়ী এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। নজরুল গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাকে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জেল থেকে ফিরে এক বছর হুগলীতে কাটান। তারপর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে চলে যান। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক হিন্দু রমণী প্রমিলা দেবীকে বিয়ে করে সংসারী হন। সংসারী হয়েও তার অভাব অনটন চলতে থাকে। তাছাড়া পুত্রের মৃত্যুতে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মেগাফোন রেকর্ডিং কোম্পানীতে সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেও তার আর্থিক কোন সুরাহা হয়নি। প্রকাশকরা তাঁর বিভিন্ন প্রকাশিত পুস্তকের জন্য সময়মত তাঁকে পাওনা অর্থ দিত না। ফলে অনটন বেড়েই চলছিল।

নজরুল ইসলামের সাঙ্গীতিক অবদান

বাংলা সংগীতের মধ্য যুগ ও আধুনিক গানের পূর্বযুগে—বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল গীতিকারেরা সংগীত রচনা করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই নিজেরা ছিলেন সুরকার। বাংলা সঙ্গীত জগতে যাঁরা স্বকীয় প্রতিভা রেখে গেছেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ। এক কথায় এই যুগটিকে রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের যুগ বললে অত্যুক্তি হবে না। এদের সংগীত রচনার বিভিন্ন ধারার সংগে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিকতার সেতু বন্ধন করেছেন, সুরকার ও গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সুরের মধ্যে দিয়ে ও গীত রচনার মধ্যে দিয়ে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। নজরুলের গান আঙ্গিকের বিচারে বিশেষভাবে আধুনিক, কিন্তু গীতি রচনার কবি কৃতীর দিক থেকে নজরুল রবীন্দ্র সমসাময়িকের পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সংগীত রচনা খুবই আশ্চর্যের কথা। গান রচনা এবং সুরারোপে আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গি নজরুলকে নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে দিল। নজরুলের গানে এই নতুন আঙ্গিকই আধুনিক গানের মূল কথা। সহজ কথায় সুর সংযোজনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা প্রকাশ করলেন নজরুল ইসলাম তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে।

শ্রোতার মনোভাবের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ উপস্থাপিত করলেন নজরুল। নজরুলের গানে উচ্ছ্বসিত আবেগ প্রবণতা আছে। সুর সৃষ্টিতেও সেই প্রবণতা কম কিছু নয়। তাই একথা বলা চলে যে আধুনিক গানের গোড়াপত্তন নজরুল থেকে শুরু হয়েছে। নজরুলের প্রতিভা, প্রথমদিককার বাংলা গানের ধারার গতানুগতিক পথটি থেকে সরে দাঁড়াল।

১৯২০—১৯৩০-এর মধ্যে নজরুলের প্রকাশ ও বিস্তার। কিন্তু তাঁর গীত সৃষ্টির নবচেতনার দিকটি উদ্ভাসিত হয় ১৯৩০ সন থেকে ১৯৪০ সনের মধ্যে রেডিও ও গ্রামাফোন রেকর্ডের মাধ্যমে।

কাজী নজরুল ইসলামের গানের জগৎটি বৈচিত্র্যেভরা। তাঁর এই সংগীত জগৎ সৃষ্টির প্রাচুর্যে, সুর সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে এবং বিভিন্ন ধরনের গানের রচনায় সুরের মাদকতায় ভরপুর। বহু গান লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। যখন যিনি যা চেয়েছেন তাকেই তিনি গান বিলিয়েছেন—কাকে কি তিনি লিখে দিয়েছেন তার হিসাবও তিনি রাখেন নি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই স্বভাব কবি নজরুল অগণিত গান লিখেছেন। তাঁর সংগীত রচনার সংখ্যা কয়েক হাজার। অনেকে বলেন কবিগুরুর চাইতেও তাঁর সংগীত রচনার সংখ্যা হয়তো কিছু বেশীও হতে পারে। সৃষ্টিপ্রাচুর্যের অধীশ্বর নজরুল ইসলাম খুবই উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাই তিনি তাঁর বেপরোয়া জীবনের সাথে সংগতি রেখে সংগীত সৃষ্টি চালিয়ে গেছেন উদাসীনভাবে।

নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি আবার সুরেরও কবি। বিদ্রোহের গানে তাই তাঁর ফুটে উঠেছে ভাঙ্গার আবেগ, বাঁধন ছেঁড়ার প্রবণতা আবার সুরের কবি নজরুলের সুরের সৃষ্টিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে সৌন্দর্যময় পৃথিবী ও ঐক্যের পৃথিবীর আর একটি চিত্র। দারিদ্র্যের কবি নজরুলের বিদ্রোহমূলক গানের পশ্চাতে ছিলো তাঁর সাম্যের বাণী, ঐক্যের ধ্যান, শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে ভেংগে ফেলে নতুন করে সমাজ গড়ার স্বপ্ন। তাই তাঁর বিদ্রোহমূলক এবং স্বদেশী চেতনার গানগুলিতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহের সুর এবং পরাধীনতার শৃংখলভাংগার হুংকার।

অন্যদিকে প্রেমিক নজরুলের আধুনিক গানে তাঁর প্রেমময় অভিব্যক্তি নতুন একটা রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ তিনি যে হাতে অসি ধরেছেন আবার সে হাতে বাঁশী বাজিয়ে সংগীত লহরীর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এক চোখে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে অন্য চোখে বিরহিণীর করুণ আবেগ ছলছল করে উঠেছে।

নজরুলের গানগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন গজল, কাব্যগীতি, কোরাস, রাগপ্রধান, বিদেশী সুরের কাঠামোয় রচিত গান, লোক-গীতির প্রভাবে সৃষ্ট সংগীত ও ধর্মীয় সংগীত।

নজরুলের গজল

বাংলা গজল গানের প্রবর্তক কাজী নজরুলকেই বলা যেতে পারে। গজল পারস্য দেশীয় প্রেমসংগীত। একটা বিশেষ গায়কী ও ঢঙ অবলম্বনে এই গজল গানের সৃষ্টি। এই গজল গানের অস্থায়ী অংশ ছন্দে বাঁধা এবং দ্রুত ও মধ্যলয়ে গেয়। পরের অংশগুলিতে থাকে কয়েকটি অন্তরা। এই অন্তরাগুলি তাল ছাড়াই গাওয়া হয় এবং ঢিমে ছন্দে আবৃত্তির আকারে সুর করে কথাগুলি বলা হয়। এক কথায় এই অংশগুলি সুরে বাঁধা আবৃত্তি। এরই নাম হলো "শ্যের" বা "শয়ের"। এই শ্যের গেয়ে আবার অস্থায়ীতে ফিরে আসা হয় এবং তখন আবার তালের আবর্তন শুরু হয়। এই ধরনের গজল গানের আবেদন খুবই গতিশীল এবং হৃদয়গ্রাহী। শ্রোতাদের কাছে তবলাবাদক এবং গায়কের পারস্পরিক তাল ও সুরের খেলা গজল গানে সত্যই উদ্দীপনামূলক। গজল গান নিঃসন্দেহে লাইট ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং শিল্পীকে গজল গাইতে হলে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নেওয়া খুবই প্রয়োজন। ভালো ঠুংরি দাদরা গাইয়েরাই এই গজল গানে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। প্রসংগত বেগম আখতার, মেহেদি হাসানের নাম উল্লেখযোগ্য।

নজরুল তাঁর গজল গানগুলির প্রচার শুরু করেন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি

থেকে। গ্রামাফোন রেকর্ডের মাধ্যমে নজরুল ইসলামের গজল গানগুলি পরিবেশিত হয় শ্রীমতি আঙ্গুরবালা দেবী, শ্রীমতি ইন্দুবালা দেবী, শ্রীমতি কমলা ঝরিয়া দেবীর অপূর্ব কণ্ঠের মাধ্যমে। ওই গানগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে শ্রোতাদের মনে মনে। গানগুলির বাণীর সরলতা ও সুরের নতুন আস্বাদন শহরের অভিজাত সমাজের মধ্যে প্রচলিত হলেও সুদূর গ্রামাঞ্চলে ও শহরতলীতেও এর আবেদন সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। তাই কারখানার শ্রমিক বা গ্রামের মেঠো পথের গাড়ির চালকের কণ্ঠে নজরুলের এ গান এক সময় মুখে মুখে ফিরছে, এই খানেই সুরকার, শিল্পী, ও গীতিকার নজরুল ইসলামের সফলতা। কাজী সাহেব অগণিত গজল গান লিখেছেন, যে গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সেগুলি হলো "বাগিচায় বুলবুলি তুই," কে বিদেশী মন উদাসী, আমার চোখ ইশারায় ডাকদিলে কে গো দরদী, কেন কাঁদে পরান কি বেদনায়, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, অতীত দিনের স্মৃতি, আলগা কর গো খোপার বাঁধন, "মোর ঘুম ঘোরে", ইত্যাদি। কাজী নজরুলের গজল গানগুলিতে আঙ্গিকের দিকটা তিনি বেশী নজর দিতে গিয়ে কাব্যের দিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুর অপেক্ষা ম্লান হয়েছে। আরবী, পারসী শব্দও তাঁর কিছু কিছু গানে তিনি ব্যবহার করেছেন। সুরের আঙ্গিকতা এতই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে বাণীর স্বকীয়তা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ হলেও সুরের ঐন্দ্রজালিক ছোঁয়ায় তা শ্রোতাদের কাছে ধরা পড়েনি। আর তাছাড়া বাংলা গানের ইতিহাসে গজল গানের এই নতুন রূপ শ্রোতাদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলো সেই যুগে। তাঁর গজল গানে ভীমপলশ্রী, খাম্বাজ, বিহরী, মাঁন্দ, পাহারী ইত্যাদি সুরের এবং আদ্ধা, লাউনী ঠেকা, দাদরা এবং কার্ফা ছন্দের প্রকাশ লক্ষণীয়। লোকসঙ্গীতের বহু সুরও তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমন্বয়ে রূপায়িত করেছেন তাঁর এই গজল গানের মধ্যদিয়ে।

কাব্যগীতি

নজরুল জীবনে বহু কাব্যগীতি রচনা করে গেছেন, তার এই কাব্যগীতি-গুলি একদিকে যেমন রচনায় সমৃদ্ধ অন্যদিকে সুরের বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। অর্থাৎ এই সব গানে কথা ও সুরের অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। যদিও নজরুলের এই কাব্যগীতিগুলি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য রচনাগুলির মতো উৎকর্ষতা সর্বক্ষেত্রে লাভ করে নি, তবু একথা বলা চলে ঐ রচনাগুলির একটা স্বতন্ত্র আবেদন আছে। কিছু কিছু গান সত্যি খুবই সুন্দর। তবে কিছু গান আবার কাব্যিক বিচারে এবং ছন্দ-মিলে ততটা উৎকর্ষতা লাভ না করলেও সুরের উৎকর্ষতায় সে সব গান মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। খেয়াল ও ঠুংরি গানের রসে কাজী সাহেব নিজে তন্ময়

হয়ে থাকতেন। তাই তাঁর কাব্যসঙ্গীতগুলি ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণী ভিত্তিক। কয়েকটি এই ধরনের গানের উল্লেখ করা যায় যেমন—"আজি নিঃঝুম রাতে"—দরবারী কানাড়া রাগে রচিত। "ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান" গানটি মূল বেহাগ রাগকে ভিত্তি করে রচিত। ললিত রাগের উপর রচিত তাঁর 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে' গানটি খুবই জনপ্রিয়। এই ধরনের গানের মধ্যে 'মোর ঘুম ঘোরে" —ভৈরবী—"কেন কাঁদে পরাণ"—তিলক কামোদ "অরুণ কান্তি কে গো যোগী ভিখারী"—আহিরী ভাঁইরো 'তুমি শুনিতে চেয়োনা"—খাম্বাজ ইত্যাদি। রাগ-রাগিণী ছাড়াও কাজী সাহেব কিছু কিছু কাব্যগীতি রচনা করেছেন লোক সঙ্গীতের সুরের আলোকে। উত্তর ভারতের বিখ্যাত লোকগীতি কাজরীর প্রভাবে তিনি তাঁর বহুল প্রচলিত গান "শাওন আসিল ফিরে" রচনা করেছেন। এছড়া ঝুমুর সঙ্গীতের —প্রভাবে তিনি রচনা করেছেন 'নিম ফুলের মৌ পিয়ে" গানটি। এই ধরনের তাঁর বহু গান আছে। অন্য গানের মধ্যে শচীনদেব বর্মনের 'পদ্মার ঢেউরে' গানটি লোকসঙ্গীতের সুরের আলোকে প্রভাবিত। নজরুলের কাব্যগীতিগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রেম পর্যায়ের গান। সে গানে আমরা স্বাভাবতই দেখতে পাই তার কবি মনের রোম্যান্টিক ভাবাবেগ। না পওয়ার বেদনা, প্রিয়ার জন্য হৃদয়ের আকুলতার চিত্র খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে কাজী সাহেবের এই কাব্যগীতিগুলির মধ্যে।

তাঁর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতন বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যে ভরা ঋতু পর্যায়ের গান খুব একটা বেশী না থাকলেও যে দুচারটি পাওয়া যায় সেগুলি নিঃসন্দেহে কথা ও সুরের উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ। যেমন, বর্ষার ঋতুর উপর তার একটি অনবদ্য রচনা গ্রামাফোন রেকর্ডে দিপালী নাগ কর্তৃক গীত 'মেঘমেদুর বরষা" ও মিশ্রাকী-মল্লার রচিত 'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা'। কবিগুরু তার প্রকৃতি বিষয়ক গানেতে যে দর্শনের উপর ভিত্তি করে নিজেকে রচনার মাধ্যমে হারিয়ে ফেলেছেন—যার জন্য কবিগুরুর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে একটা universal appeal আমরা খুঁজে পাই, নজরুলের —রচনায় সেই appeal বিদ্যামান না থাকলেও মানবিক প্রেমের অপূর্ব মূর্ছনায় সেই গানগুলি রসাপ্লুত। কবিগুরুর উপলব্ধি হয়তো আরও বেশী এবং গীতি কবিতা হিসাবে অনেক বেশী সমৃদ্ধ; তবু একথা বলা চলে যে কাজী সাহেবের কাব্যগীতিগুলির মধ্যে আমরা খুজে পাই তাজা ও জীবন্ত রোম্যান্টিক আবেদন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলির মধ্যে—জৈবকামনা-বাসনার অনুভূতি কম এবং আবেগ ও প্রকাশ ভঙ্গিমা অনেক গভীর তবু একথা বলা চলে নজরুলের প্রেমের গানগুলিতে জৈবকামনা-বাসনা, অনুভূতি থাকলেও, অনেক বেশী রোম্যান্টিক এবং expressive.

কবি আরবী, পার্সি ও উর্দু কবিদের রচনার অনুসরণে তার কাব্যগীতিগুলি

অনেক ক্ষেত্রেই রচনা করেছেন। তাই বিখ্যাত উর্দু পারসিক কবি গালিব, ইকবাল, দানমীর প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের রচনার প্রভাবে প্রভাবিত।

নজরুলের কাব্যগীতিগুলির মধ্যে কিছু গান ভক্তিগীতির পর্যায়ভুক্ত। তারমধ্যে শ্যামাসঙ্গীতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এ ছাড়া তার, রচিত ইসলামিক গান বা কীর্তন, ভজন খুবই সমৃদ্ধ রচনা। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠে যে কটি শ্যামাসঙ্গীত আজ আমদের মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়ে আছে সেগুলির মধ্যে "শ্মশানে জাগিছে শ্যামা", ভবানী দাসের "বলরে জবা বল কোন সাধনায় পেলি" ইত্যাদি গানগুলি। কাজী সাহেবের ভক্তিমূলক গানগুলি সত্যি ভক্তি রসে আপ্লুত। সেগুলি কাব্য সঙ্গীতের মধ্যে না ফেলে একটা আলাদা পর্যায় ভুক্ত করাই ভাল তার সেই অমূল্য অনবদ্য রোম্যান্টিজমে ভরা গানদুটি সবার মনে চিরকাল বিরাজ করবে যেমন "মমতাজ তোমার তাজমহল যেন বৃন্দাবনের একমুঠো প্রেম আজও করে ঝলমল" এবং "আমায় নহে গো ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান"॥

অথবা,

"প্রদীপ নিভায়ে দাও উঠিয়াছে চাঁদ,
বাহুর ডোরে আছে মালায় কি স্বাদ?"

কাজীসাহেবের বিভিন্ন ধরনের কাব্যগীতিগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডও রেডিওর প্রচারিত ৺শ্রীমতী ইন্দুবালা, ৺আঙ্গুরবালার কমলা ঝরিয়া, ৺শচীনদেব বর্মন, ৺কমল দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, ৺চিত্ত রায়, জগন্ময় মিত্র, শুপ্রভা সরকার, ফিরজা বেগম, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, বিমল ভূষন, মানবেন্দ্র মুখার্জী, ডঃ অনুপ ঘোষাল, ধীরেন বসু, প্রমুখ শিল্পীদের কণ্ঠে।

ক্লাসিকো মর্ডান গান বা রাগাশ্রিত আধুনিক গান

এই ধরনের গানের বৈশিষ্ট্য হল গানগুলি রাগভিত্তিক এবং বাণীর অংশ কাব্যময়। কোন কোন গানে কোন বিশেষ রাগের প্রাধান্য থাকলেও অন্য রাগের মিশ্রণ লক্ষণীয় কাজী সাহেবের গানে। রাগপ্রধান গানগুলি পরিবেশনের সময় রচনার কাব্যিক প্রকাশ সাধারণত ধরা পড়ে না শিল্পীদের কণ্ঠে। অর্থাৎ শিল্পীরা গানের ভাবের চাইতে ওস্তাদীর মার পেঁচটাই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে কিন্তু নজরুলের গান রাগভিত্তিক হলেও শিল্পীকে তার কাব্যিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ভাব ও গায়কীর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়। কাজী সাহেবের প্রসিদ্ধ ছায়ানট রাগের উপর রচিত "শূণ্য এ বুকে পাখী মোর" গানটি ৺জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠে অনবদ্য ভাবে গ্রামাফোন রেকর্ডে ধরা আছে। কিন্তু সেখানেও দেখেছি যেহেতু গানটি পুরোপুরি রাগভিত্তিক সেখানে শিল্পী রাগসঙ্গীতের অলংকার পরিবেশন

করতে অর্থাৎ তানের কাজ দেখানোর প্রবণতা থেকে নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। গানটি শ্রোতাদের খুবই মন জয় করেছে সন্দেহ নেই। তবু মনে হয় রাগসঙ্গীতের অলঙ্কার বেশী ঝকঝকে হয়ে উঠলে গানের কাব্যিক আবেদনটি অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ হয়। শচীনদেব বর্মন অবশ্য তাঁর অপূর্ব নিবেদন খাম্বাজ রাগের উপর কাজী সাহেবের জনপ্রিয় গান "কুহু কুহু কোয়েলিয়া" রেকর্ড করবার সময় সাঙ্গীতিক অলঙ্কারের সঙ্গে কাব্যিক সৌকর্যের আবেদন তাঁর সংগীত পরিবেশনে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই রাগভিত্তিক হলেও সে গান সার্থক কাব্যগীতি হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ ভারতের বহু রাগরাগিণী কাজী সাহেব উত্তর ভারতীয় রাগরাগিণীর সঙ্গে মিশ্রণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর বহুগানের স্বরারোপ করেছেন। স্বরের স্থান পরিবর্তন বা চালাচালির মাধ্যমে তিনি নিজেও কয়েকটি নতুন রাগের সৃষ্টি করেছেন।

ভারতীয় সংগীতের সম্যক জ্ঞান অর্জন করে কীর্তন, লোকসংগীতের সুর ও রাগরাগিনীর মিশ্রণে যে অপূর্ব সুর সৃষ্টি করেছেন তা থেকেই বুঝা যায় যে কাজী কতবড় সুর স্রষ্টা ছিলেন।

নজরুল বহু গান হুবহু হিন্দী খেয়াল ও ঠুংরী গানের সুর অবলম্বনে রচনা করেছেন, যেমন, 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' গানটির মূলে আছে 'ন মানুঙ্গী ন মানুঙ্গী' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী গানটি, আবার "পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া"র পিছনে আছে 'পিউ পিউ রটত পাপিহরা বোলো' গানটি, 'মেঘ মেদুর বরষায়, গানটির পিছনে আছে জয় জয়ন্তী রাগের হিন্দী খেয়াল 'চল চল হেট সেঁইয়া' গানটি। এই ধরনের তাঁর বহু গান হুবহু হিন্দী খেয়াল ও ঠুংরী অবলম্বনে রচিত।

আগেই বলেছি যে নজরুল দাক্ষিণী বা কর্ণাটী ধারায় বহু গান রচনা করেছেন। তিনি দাক্ষিণী যে সব রাগ-রাগিনী নিয়েছিলেন সেগুলি হ'ল কর্ণাটী সামন্ত, নীলাম্বরী সিংহেন্দ্র মধ্যমা প্রভৃতি।

নজরুলের কোরাস গান

কোরাস গান বাংলাগানের জগতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত এক বিরাট আসন জুড়ে আছে। বাংলায় কোরাস গানের জন্ম হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য এবং দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য একে একে এগিয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, গনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, গিরিশ ঘোষ প্রমুখ গীতিকারগণ। পরে সেই পথে এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদ

প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত সেন, কামিনী ভট্টাচার্য এবং কাজী নজরুল ইসলাম। এঁদের সঙ্গে চারণকবি মুকুন্দদাসেরও নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে পঞ্চ গীতিকার বাংলা সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে উজ্জ্বল করেছিলেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল। এঁরা নিজেরা গান রচনা করে নিজেরাই তাতে সুরারোপ করতেন । এই গীতিকারেরা প্রতিটি বাঙালীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের অনবদ্য সংগীত রচনার মাধ্যমে। কবিগুরু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয় চেতনামূলক যে কোরাস গানগুলি রচনা করেছিলেন সেইগুলি অধিকাংশই বাউল ও কীর্তন ভাঙা সুরে রচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানগুলি রাগরাগিনী ভিত্তিক হলেও বিদেশী সুরের কাঠামোয় ছন্দবহুল সৃষ্টি। সুরসৃষ্টির কায়দাটুকু বিলিতি চার্চ মিউজিকের ছন্দে সৃষ্ট। অতুলপ্রসাদ কবিগুরুর আদর্শে কোরাস গানগুলির সুরের কাঠামো সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ বিদেশী সুরের ধাঁচে রাগরাগিনীগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন। বাউল কীর্তনের সুরের প্রভাবও অতুলপ্রসাদের কোরাস গানে লক্ষণীয়। নজরুল কিন্তু যে সব কোরাস গান রচনা করেছিলেন তা সুরের দিক থেকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—মার্চের সুরে রচিত কিছু গান যার মধ্যে কুচকাওয়াজের গান, নারী জাগরণের গান, ছাত্রদলের গান, সৈন্যদলের গান বিদ্যমান। আরেক ধরনের কোরাস গান তিনি রচনা করেছিলেন যা পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী—বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে। কাজী নজরুলের যে জাতীয়তামূলক গানগুলি প্রতিটি বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে যে গানগুলি আছে সেগুলি হল "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" "তোরা সব জয়ধ্বনী কর", "কারার ঐ লৌহকপাট", "এই শিকল পরাই ছল" ইত্যাদি গানগুলি। এছাড়া তাঁর অন্যান্য কোরাস গানগুলির মধ্যে শ্রমিকের গান, কৃষকের গান, ইনটারন্যাশনাল সংগীত আছে।

সুরের দিক থেকে কাজী সাহেবের কোরাস গানগুলি সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা চলে :

প্রথমটি হল বিদেশী সুরের কাঠামোয় রচিত যেমন—"দুর্গম গিরি", "জাগো অনশন বন্দী", "চল্ চল্ চল্"।

ও "আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে—'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' "শিকল পরাই ছল", কারার ঐ লৌহকপাট' ইত্যাদি। কাজী সাহেবের উদ্দীপনাও উন্মাদনাভরা ছন্দবহুল রণসংগীত "টলমল টলমল পদভরে", "জাগো নারী বহ্নিশিখা" প্রভৃতিতে নিঃসন্দেহেই কিছু রাগরাগিনীর প্রভাব আছে।

তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মৈত্রীর সুরের আদর্শে রচিত বিখ্যাত কোরাস গানটি হিন্দু মুসলমান মিলনের সেতুবন্ধ হয়ে থাকবে চিরকাল যেমন,

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" গানটি রাগসংগীতের কাঠামোয় সুরারোপিত।

বিদেশী সুরের আলোয় নজরুলের সৃষ্টি

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত বহু গান বিদেশী সুরের ঢঙে সৃষ্টি করেন এবং সে গান সংগীতের ইতিহাসে এক নতুন সাক্ষর হয়ে আছে। কাজী সাহেবের সৃষ্ট গজল গানগুলি যেমন আরবী, ফার্সী গানের অনুসরণে রচিত তেমনি অন্যান্য সুরও তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর সুর সৃষ্টির প্রয়াসে। জীপসী নাচ এবং তাঁদের গান এক বিশেষ ঢঙে পরিবেশিত হয়ে আসছে সারা বিশ্বে। এই জীপসী সুরে তাঁর কিছু গান সৃষ্টি করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা মায়াখেলায় যে যে গান সৃষ্টি করেছেন তা যেমন আইরিস ও ইটালীয় সুরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের কোরাস গানগুলিও চার্চ মিউজিকের স্বরবিন্যাসের ঢঙে রচিত। সেই সংগে সংগে পরবর্তীকালে আমরা নজরুলের সুরসৃষ্টিতে দেখেছি যে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির প্রচলিত সুরের মাধ্যমে গান রচনা করেছেন "দুরদ্বীপবাসিনী, আমি চিনি তোমারে চিনি"। আরবী সুরের প্রভাবে যে গান দুটি সবার মুখে মুখে ফেরে—তা হল, "শুকনো পাতার নুপুর বাজে নাচিছে ঘূর্ণিবায়" এবং

"চম্‌কে চম্‌কে ধীরু ভীরু পায়"
পল্লীর বালিকা বন পথে যায়
একেলা বন পথে যায়।"

আবার মিশরীয় নাচের ছন্দে ও সুরে তিনি গান রচনা করেছেন 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়'। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের গানের সুরের ঢঙে রচিত তাঁর কিউবান ডান্সের সুরে রচিত গানটি প্রতিটি বাঙালির মুখে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গানটি হল—

"দুরদ্বীপবাসিনী, চিনি তোমারে চিনি
দারুচিনির দেশে তুমি বিদেশিনী গো সুমন্দ ভাসিণী"

এই ধরনের আরবী সুরের ঢঙে তিনি বহু ইসলামিক ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন।

লোকগীতির আলোকে নজরুলের সুরসৃষ্টি

কাজী সাহেব বেশ কিছু গান তিনি লোকগীতির ঢঙে রচনা করেছেন। অবিভক্ত বাংলার ভাটিয়ালী, সারি, জারি, বাউল এবং রাঢ় বাংলার লেটো, ঝুমুর

ইত্যাদি বহু প্রচলিত লোকগীতির সুরের আলোকে তার সুরসৃষ্টি সার্থক করে তুলেছেন।

বাংলার প্রচলিত লোকসংগীত ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারত এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকগীতির সুরও তিনি নিয়েছেন তাঁর সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গতঃ এখানে ভারতের আঞ্চলিক সঙ্গীত কাজরী, চৈতী, লাউনীর নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশের বহুল প্রচলিত কাজরীর ঢঙে তিনি রচনা করলেন "শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না"। স্বনামধন্য শিল্পী শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে রেকর্ডে গাওয়া "মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে' গানটি দক্ষিণ ভারতীয় লোকগীতির একটা বিশেষ ঢঙে কাজী সাহেবের হাতে পড়ে এক বিশেষরূপের সৃষ্টি হয় নজরুলগীতির ভাণ্ডারকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। বাংলার বাউল গানের ঢঙে তাঁর যে দুটি গান আছে তা হলো—

"পথ ভোলা কোন বাউল ছেলে,
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশী ফেলে"

এবং—

আমি ভাই, ক্ষেপা বাউল,
আমারই এই দেহ,
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে শুধু
অন্তরে মন্দির গেহ।

অথবা—

আমি বাউল হলাম ধূলির পথে লয়ে তোমারি নাম।
আমার একতারাতে বাজে শুধু তোমারি গান, শ্যাম॥

এবার পূর্ব বাংলায় (অধুনা বাংলাদেশ) বহুল প্রচলিত ভাটিয়ালী সুরের ঢঙেতে কাজী সাহেব সৃষ্টি করলেন তাঁর বিশেষ এক ঢঙের দুটি, গান যেমন—

"আমি গহীন গাঙের নাইয়া,
এবং "কুঁচবরন কন্যা তার মেঘ বরন কেশ,
অথবা, "আমার 'শাম্পান' যাত্রী লয়, ভাঙা আমার তরী।"

শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে ভাটিয়ালী ঢঙের সেই অপূর্ব গানটি "পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয়পদ্ম নিয়ে যা যা যারে" আজও আমাদের কানে বাজে।

'নিম ফুলে মৌ পিয়ে' গানটি রাঢ় বাংলার বহুল প্রচলিত লোকগীতি ঝুমুরের ঢঙে রচিত। শচীনদেব বর্মনের রেকর্ডে গাওয়া 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিসরে' গানটিও ঝুমুর গানের ঢঙে রচিত। দ্বৈত কণ্ঠে নজরুলের একাধিক ঝুমুর গান আছে যেমন,

"পুরুষ—ঝুমুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে,
বাজে বাজে লো ঘুঙুর কাহার পায়ে,
স্ত্রী—হাতে তল্‌তা বাঁশের বাঁশী,
মুখে জংলা হাসি,
কে ওই বুনো গো, বেড়ায় আদুল গায়ে",—ইত্যাদি।

ঝুমুর ঢঙে তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ গানের উল্লেখ না করলে ভুল করা হবে। যেমন—

"হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল,
এনে দে এনে দে, নইলে বাঁধব না চুল।"

নজরুলের জন্ম বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। সেখানে তিনি গ্রামের জীবনের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই বড় হয়ে উঠেছেন। স্থানীয় লেটোদের দলে গানও গেয়েছেন। পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়ার লালমাটির দেশের সুর তাই তাঁর ভাবনা চিন্তা এসে স্থান করে নিয়েছে,—তাঁর সৃষ্ট গানগুলির মধ্যে লোকগীতির কাঠামোয় বহু গানই তিনি রচনা করে বাংলার সঙ্গীত ভাণ্ডারকে উজ্জ্বল করেছেন।

ধর্ম সঙ্গীত

নজরুল তাঁর জীবনের শেষের দিকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কয়েক বছর ধরে বহু ধর্মসঙ্গীত সৃষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বহু গান তিনি ওই সময় লিখেছেন। যে কবি সাম্যের গান গেয়েছেন,—যে কবি বিদ্রোহের গান গেয়েছেন তাঁর লেখনীতে সৃষ্টি হয়েছে একই সঙ্গে ধর্মীয় সঙ্গীত. এটা ভাবতেও আমাদের অবাক লাগে। হয়ত, জীবনের শেষ কটি বৎসর তিনি ঈশ্বর প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। একে একে প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুশোক, ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, স্ত্রীর অসুখ ইত্যাদি নানা কারণে তিনি দুর্বল মানসিকতায় ভুগছিলেন, হতাশা হয়ত তাঁর জীবনকে ধর্মীয় সঙ্গীত রচনায় ঠেলে দিয়েছিল। কাজী নজরুল ধর্মীয় সঙ্গীতের মধ্যে বহু শ্যামা সঙ্গীত, কীর্তনাঙ্গের গান, ইসলামী গান. এবং ভজন ঢঙের গানও রচনা করেছিলেন। ইসলামী গানের মধ্যে দু' চারটি গান আব্বাস উদ্দিন সাহেবের কণ্ঠে রেকর্ডও হয়েছিল গ্রামাফোন রেকর্ড কোম্পানীতে। ধর্মীয় সঙ্গীত কাজী সাহেব তিরিশের দশকের শেষ দিকে বেশী করে লিখেছিলেন। শ্যামাসঙ্গীত গায়ক কে, মল্লিক. ভবানী দাস, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রমুখ শিল্পীর কণ্ঠে নজরুলের বহু গান রেকর্ড করা আছে গ্রামাফোন কোম্পানীতে। বিখ্যাত দুটি শ্যামাসঙ্গীত বাঙালীর চিরকালের গর্ব হয়ে আছে। যেমন—

"বলরে জবা বল,
কোন সাধনায় পেলি রে তুই,
শ্যামা মায়ের চরণ তল।" ইত্যাদি

এবং,

"মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী"।

উপরোক্ত গান দুটি দেশ এবং দুর্গা রাগে সুরারোপিত। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন যে গান দুটি তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলেছে তা হ'ল—

"মোর ঘনশ্যাম, এলে কি আজ কালো মেঘের বেশে,
দূর মথুরার নীল যমুনা পার হয়ে মোর দেশে।"

এবং "আমি কি সুখে লো গৃহে রব,
আমার শ্যাম যদি ওগো যোগী হ'ল, সখি,
আমিও যোগিনী হব।" ইত্যাদি।

এই গানটিতে পদাবলী কীর্ত্তনের আমেজ সুস্পষ্ট। এই ধরনের বহু বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গান তাঁর রচনায় আমরা দেখে থাকি।

বহু ইসলামী গান নজরুল লিখেছেন। তারও সংখ্যা প্রায় শ' দুয়েক। তাঁর বিখ্যাত ইসলামিক গীতির মধ্যে আছে,

"রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ,"
"ওরে ও নতুন ঈদের চাঁদ,"
"আল্লার নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়
"আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে. শিশু নবী আহম্মদরূপে লহর তুলে।"

ধর্মীয় সঙ্গীতের মধ্যে তাঁর "তুমি আশমানে কালাম," আর, মারফতী গানের মধ্যে আছে, "দুখের সাহারা পার হয়ে আমি চলেছি কাবার পানে।" 'মহরম'কে নিয়ে তাঁর রচিত গান বাঙালি মুসলমান সমাজে খুই সমাদৃত। যেমন—"মহরমের চাঁদ এলো ওই কাঁদাতে ফের দুনিয়ায় ইত্যাদি।

অতুলপ্রসাদ সেন

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে অতুলপ্রসাদ সেন একটি স্মরণীয় নাম। তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর ঢাকায় (অধুনা বাংলাদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে অতুলপ্রসাদ পিতৃহীন হন। তারপর থেকে তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছে তিনি মানুষ হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইংলণ্ডে যান এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইংল্যাণ্ডে থেকেও অতুলপ্রসাদ তাঁর সংগীতে যে পাশ্চাত্য সুর গ্রহণ করেন নি এটি বিস্ময়। ইংরেজী ভাষায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধটির বিষয় ছিল ভারতীয় সংগীতের আদর্শ ও বিলেতি গানের সঙ্গে তার পার্থক্য।

অতুলপ্রসাদের কর্মজীবন শুরু হয় লক্ষ্ণৌ শহরে। প্রত্যক্ষভাবে তিনি রাজনীতি অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন মহামতি গোখেলের অনুবর্তী। তিনি প্রচুর দান করেছেন জীবিত অবস্থাতেই।

আবার জনকল্যাণের জন্য সম্পত্তি ও অর্থ-দান করে উইল করে গিয়েছেন। বেশ কয়েকবার তিনি বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ও নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অতুলপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। তাই তাঁর গানে বিরহের সুর ফুটে উঠেছে। 'কাকলী' পুস্তকটিতে তাঁর গান সংকলিত হয়েছে। তাঁর লেখা আর একটি গানের বই হল 'গীতগুঞ্জ'। সামান্য কিছু গান লিখে বাংলা সঙ্গীত জগতে অতুলপ্রসাদ অমর হয়ে রয়েছেন।

অতুলপ্রসাদের গান

অতুলপ্রসাদের গানকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) ব্রহ্মসঙ্গীত (খ) দেশাত্মবোধক সংগীত (গ) ঋতু সংগীত।

(ক) ব্রহ্মসঙ্গীত

অতুলপ্রসাদের ব্রহ্মসঙ্গীত প্রধানতঃ বিভিন্ন রাগ রাগিনী এবং কীর্ত্তন ও বাউল সুরের সমন্বয়ে রচিত। অতুলপ্রসাদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল হিন্দুস্থানী লঘু খেয়াল, ঠুংরী ও দাদরা সংগীতের রূপের সঙ্গে। তাছাড়া কীর্ত্তন ও বাউলগান তাঁর হৃদয়কে জয় করেছিল তাই তাঁর গানে কীর্ত্তন ও বাউলের সুর আমরা শুনতে পাই। গানের বাণী সহজ কিন্তু কাব্যিক। রবীন্দ্র প্রভাব তাঁর গানে থাকলেও আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য গায়কীতে আছে। তাঁর ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে বাণী ও সুরের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। তিনি কখনও বাণীকে উপেক্ষা করে গানের কাব্যিক ভাব প্রবাহকে বাধা দিয়ে সুরসৃষ্টির চেষ্টা করেননি। যদিও তাঁর গীতি রচনা রবীন্দ্রনাথের মতো সার্থক রূপ নেয়নি, তবুও একথা বলা চলে যে তিনি একজন সার্থক গীতিকার। রাগাশ্রিত তাঁর গানগুলি মোটামুটি একটা বাঁধনে বাঁধা থাকলেও শিল্পী সে বাঁধন উপেক্ষা করেও তাঁদের স্বাধীন মনোভাব নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে গেয়ে থাকেন। তাঁর বহু গান রাগাশ্রিত। ঠুংরি ও দাদরা হ'ল, প্রেমের গান, দাদরার রীতিকে অনুসরণ করে তিনি গাইলেন :

"ওগো নিঠুর দরদী, তুমি খেলছ অনুক্ষণ।"

"সে ডাকে আমারে" গানটি রচনা করলেন তিনি ভাতখণ্ডেজীর 'ভবানী দয়ানী' গানটির ছায়া অবলম্বনে। "ডাকে কোয়েলা বারে বারে" গানটি রচনা করলেন গৌড়মল্লার রাগে। ঠুংরী গানের রীতি অবলম্বনে তিনি বহু গান রচনা করলেন কারণ তিনি লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা ছিলেন। লক্ষ্ণৌ ঠুংরী গানের জন্য প্রসিদ্ধ। ঠুংরী গানের চালে তিনি রচনা করলেন "শ্রাবন ঝুলাতে, বাদল রাতে।" অন্য গানটি হলো "কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে।" এরকম বহু গান তাঁর রয়েছে। বেহাগের রাগে তিনি রচনা করেছেন "আপন কাজে অচল হলে," "নিদ্ নাহি আঁখি পাতে," "একা মোর গানের তরী," ইত্যাদি।

হিন্দুস্থানী গীতি পদ্ধতিকে মৌলিকরূপে বজায় রেখে যে বাংলা গান সৃষ্টি করা যায়, এটা তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন তাঁর সুর সৃষ্টিতে।

(খ) দেশাত্মবোধক সঙ্গীত

দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তিনি যে ক'টি লিখেছেন সেগুলি অধিকাংশই বিদেশী সুরের আলোকে রচিত। যেমন,—"উঠো গো ভারতলক্ষ্মী", ইটালীয় গানের সুরে রচিত। "বলো বলো বলো সবে" গানটিও সেই বিদেশী সুরের ছায়া অবলম্বনে সৃষ্ট। "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর", গানটি মার্চের সুরে রচিত। এই রকম তাঁর বহু দেশাত্মবোধক গান বিদেশী সুর ও ছন্দের আলোকে আলোকিত। দেশাত্মবোধক দু চারটি গান তিনি কীর্তন ও বাউলের ঢঙে রচনা করেছিলেন। যেমন—"কোথা ভানু কোথা লুকালে", "মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা" ইত্যাদি।

(গ) ঋতু সঙ্গীত

অতুলপ্রসাদের ঋতু সঙ্গীত সংখ্যায় খুব বেশী না থাকলেও যে কটি আছে সেগুলি রাগাশ্রিত। যেমন—"আইলো আজি বসন্ত মরি মরি" গানটি রচিত 'বসন্ত বাহার' মিশ্রনে। বর্ষা ঋতুর গান "ঝরিছে ঝর ঝর" ঠুংরী চালে রচিত। "আইলো শীত ঋতু" গানটি শ্রী রাগে রচিত। এই ধরনের কিছু তাঁর ঋতু সঙ্গীত রাগাশ্রিত এবং পরিশেষে এ কথাই বলা চলে যে রাগ সঙ্গীত ছাড়াও কীর্তনের ঢঙে বহু গান তিনি রচনা করেছিলেন। যেমন—"আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়", "আর কত কাল থাকব বসে"। "আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী", 'আমার এ আঁধারে এমন করে চালায় কেগো" ইত্যাদি গানগুলি সবই কীর্তনাঙ্গের। এই ধরনের বহু গান তাঁর আছে, তবে তার বেশীর ভাগই ব্রহ্মসঙ্গীত।

অতুলপ্রসাদের গানের প্রধান উৎস হল সুর। তাই সঙ্গীতের দিক থেকে তাঁর গান বৈচিত্র্যময়। এইজন্যই রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি অতুলপ্রসাদের গান এত বেশী জনপ্রিয়। রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় অতুলপ্রসাদের গানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদিও রাবীন্দ্রিক প্রভাব তাঁর গানে রয়েছে তবু তাঁর গানে কাব্যিক পরিমণ্ডলটিও গৌণ নয় বলেই হয়তো রবীন্দ্রসংগীত—গায়কেরা অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে থাকেন। অতুলপ্রসাদের গীতরচনার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুরও সহজ ও সরল, যদিও তাতে রাগের ছাপ সুস্পষ্ট।

অতুলপ্রসাদের স্বদেশী গানগুলির আধুনিকতম রূপায়ণ বিদেশী কাঠামোয় বেশীর ভাগ হলেও সহজ ও সরল। অতুলপ্রসাদের গানের গায়কীরীতি বজায় রাখার জন্য শিল্পীর শাস্ত্রীয় সংগীতের অর্থাৎ খেয়াল, ঠুংরী, দাদরার সম্যক অনুশীলন থাকা প্রয়োজন। তা না হলে গানগুলির সুষ্ঠু রূপ পরিবেশিত হওয়া সম্ভব নয়। রাবীন্দ্রিক ঢঙে অতুলপ্রসাদের গান গাইলে তার সুরসৃষ্টির

বৈশিষ্ট্যটি সম্যক বজায় থাকে না। ঠুংরী-ভাংগা গানগুলি গাইতে হলে ঠুংরীর সূক্ষ্ম কাজগুলি দিয়ে গাইলে গানগুলি সঠিক ভাবে পরিবেশিত হয়। অবশ্য কীর্তন ও বাউল ভাংগা সুরের গানগুলিতে রাবীন্দ্রিক ছাপ কিছু থাকলেও খুব একটা শ্রুতি-কটু হয় নি।

রজনীকান্ত সেন

বাংলা সংগীত জগতে আর একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রজনীকান্ত সেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই রজনীকান্ত পাবনা (অধুনা বাংলাদেশ) জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ মুনসেফ্ থেকে সাব্-জজ্ হয়েছিলেন। তাঁর পিতাও একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। রজনীকান্ত শৈশব থেকে তাঁর পিতার কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর কলেজীয় শিক্ষা হয় রাজশাহীতে (অধুনা বাংলাদেশ)। সেখান থেকে এফ. এ. পাশ করে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় বি. এ. পাশ করে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতিতে সেরকম পসার না হওয়ায় আবার রাজশাহীর বাড়ীতে ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

রজনীকান্তের কাব্য ও সঙ্গীত সাধনা

রাজশাহীতে ওকালতি করার সময় রজনীকান্ত তাঁর সংগীত ও কাব্য সাধনা পুরোদমে চালিয়ে যান। রাজসাহী থেকে প্রকাশিত 'উৎসাহ' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গান লিখতেন। ঐ সব গান নিজেই গেয়ে বহু অনুষ্ঠানে খ্যাতি অর্জন করেন। এই ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ দেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র এবং তাঁর সহধর্মিণী। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বাণী' এবং তার তিন বছর পরে 'কল্যাণী, প্রকাশিত হলে তাঁর নাম ও যশ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে বংগভংগ আন্দোলনের সময় তিনি বহু দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িক গীত-রচয়িতা ও সুরকারদের মধ্যে রজনীকান্ত সেনের গানের আংগিক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রজনীকান্তের স্বকীয় সংগীত প্রতিভা তাঁর সংগীত রচনার মূলে ছিল। যারা তাঁর কণ্ঠের গান শুনেছেন তারা সবাই একবাক্যে বলেন, তিনি একজন সত্যিকারের সংগীতশিল্পী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠের গান সেকালের জনগণকে মুগ্ধ করত। সুরের দিক থেকে যে খুব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তা নয়। রজনীকান্ত একদিকে যেমন বিভিন্ন রাগরাগিনীকে আশ্রয় করেছেন সুরসৃষ্টিতে, অন্যদিকে তিনি কীর্তন, বাউল ও অন্যান্য লোক সংগীতের সুরকে গ্রহণ করেছেন। ভৈরবী রাগিণীর উপর তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি "তুমি নির্মল কর মংগল করে" গানটি সংগীত রসিকদের অনুপ্রাণিত করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের বহু সুরের আদল তাঁর গানে পাওয়া যায়। যেমন—"কবে তৃষিত এ মরু"। তাঁর সুর সহজ ও

সরল। বিভিন্ন ধরনের গান তিনি লিখেছেন তবে ব্রহ্মসংগীতই সংখ্যায় কিছু বেশী। তিনি হাসির গানও অনেকগুলিই লিখেছেন। "বাণী" ও "কল্যাণী" বই দুটি তাঁর গীতি রচনার অনবদ্য নিদর্শন। রাগ সংগীতের প্রভাবে বেশ কিছু তাঁর গান রচিত হয়েছে। রজনীকান্তের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সরলতা। কাব্যিক রীতি তাঁর বেশ কিছু গানেতেই সুস্পষ্ট। গানের সহজ সবল অভিব্যক্তি জনসাধারণের কাছে সমাদৃত। ভাব সৌন্দর্যের আকর্ষণও তাঁর গানে কিছু কমতি নয়। 'পতিত বলিয়ে কিগো", "তোমারি দেওয়া প্রাণে", "আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ" ইত্যাদি গানগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে শুধু তাঁর গানের সহজ ও সরল আবেদনের জন্যে। রজনীকান্তের গানের সুরের বৈশিষ্ট্য আছে, তবে রবীন্দ্রসংগীত বা অতুল-প্রসাদের মত এত জনপ্রিয় হয় নি। অতুলপ্রসাদ বা ডি. এল রায়ের মত রজনীকান্তের গান বৈচিত্র্যপূর্ণ না হলেও স্বতন্ত্র একটা রূপ নিয়েছে। কান্ত কবি বিশেষভাবেই স্বভাবকবি। তাঁর রচনায়ও ব্যক্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলা গানে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের দান অনস্বীকার্য। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'আগমনী' নাটকে একটি ভিক্ষুকের কণ্ঠে আগমনী গান সেদিন বাঙালী দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। গানটি হল—

ওমা কেমন করে পরের ঘরে
ছিলে উমা বল মা তাই,
কত লোকে কত বলে
শুনে ভেবে মরে যাই।

গিরিশচন্দ্রের জীবনী

প্রসিদ্ধ নাট্যকার অভিনেতা ও সংগীত শিল্পী গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়। এ্যামেচার অভিনেতারূপে তিনি পাবলিক থিয়েটারে যোগ দেন।

পরে তিনি নাটক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রায় ৭৫ খানি নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্য গিরিশচন্দ্র রচনা করেন। এই সময় তিনি আগমনী, দোললীলা, আশাতরু প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। দ্বিতীয় যুগে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে মন দেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ত‍ঁার 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'চৈতন্যলীলা', 'প্রভাস যজ্ঞ' উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদ্দোলা', 'মীরকাসিম' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি বঙ্কিম-চন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। প্রহসন নাটকের মধ্যে 'বেল্লিক রাজার' 'ব্যায়সা কা ত্যায়সা' উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সঙ্গীতে গিরিশচন্দ্রের অবদান

অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'গিরিশ নাট্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থটি থেকে আমরা জানতে পারি যে গিরিশচন্দ্র ১৩৭০টি গান রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা 'ভ্রান্তি' নাটকটি গানে গানে সমৃদ্ধ।

'বুদ্ধদেব', 'বিল্বমঙ্গল', 'রূপ সনাতন', 'নসীরাম', 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'মায়াবসান', 'গৃহলক্ষ্মী', মুকুল মুঞ্জরা', 'বলিদান' ইত্যাদি নাটকে গিরিশচন্দ্র ভক্তিগীতি, আগমনী, শ্যামাসংগীত, বীররসাত্মক ও প্রেমের বহু গান রচনা করে বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নাটকের প্রয়োজনে গানগুলি লেখা হলেও প্রতিটি গানের আলাদা একটা সত্বা আছে—যা বাংলা গানের ইতিহাসে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর হয়ে থাকবে চিরকাল। গানের সুর তিনি বহু গানে নিজেই দিয়েছেন। আবার অন্য সুরকারেরাও সে সব গানে সুরারোপ করেছেন।

বাঙালীর নিজস্ব সংগীত, কীর্তন, বাউল ছাড়াও বেশীর ভাগ গানই তাঁর রাগাশ্রিত।

ব্রহ্মসঙ্গীত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আগে তাঁর পরিবারের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মসঙ্গীত লিখেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত আছে।

বাংলায় কিছু ধর্মমূলক গান ছাড়া একসময় ভদ্রসমাজে আর কোনো গান ছিল না বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ কিশোরী চাটুজ্যের কাছেও যে গান শিখেছেন তাও পাঁচালী গান। কিন্তু এরও আগে ধ্রুপদ গান এসেছে। এই কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজে ঠুংরীর সৃষ্টি হয়েছে। রামনিধি গুপ্তও টপ্পা এনেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভাল বাংলা গানের তেমন প্রচলন ছিল না। তখন ব্রহ্মসমাজের উপাসনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার তাগিদ এল। উনবিংশ শতকে যখন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটু ভাটা পড়েছিল বাংলায়, তখন ব্রহ্মসঙ্গীত সৃষ্ট হল ধ্রুপদকে আশ্রয় করে। এর ফলে ধ্রুপদের পুনরভ্যুত্থান ঘটল। 'ব্রহ্মসঙ্গীত' এর নামকরণ করলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ওইদিন উপাসনাতে "শাশ্বতমভয় শোকং", "বিগত বিশেষং", "ভাব সেই একে", এই ৩টি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল, এই ৩টিকেই প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

ব্রহ্মসঙ্গীতের পূর্ববর্তী বাংলা গানের মধ্যে টপ্পা ও কীর্ত্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদ ও খেয়াল ঢঙে বাংলা গান খুব কমই ছিল। রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীত আবার বাংলা গানে পুনপ্রতিষ্ঠিত হল।

রামমোহনের গানগুলি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর ও ছন্দে রচিত। তাঁর রচিত

বেশীরভাগ গানই খেয়াল অঙ্গের। রামমোহনের সময় ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্কারও ঘটে। দরবারের গণ্ডী থেকে রামমোহন সঙ্গীতকে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে ক্রমশ শিক্ষিতদের মধ্যে সঙ্গীতের স্থান হয়।

রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কাঠামোয় ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হয়ে চলে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত গুরু বিষ্ণু চক্রবর্তীও আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন। তিনিও যে গান রচনা করেছিলেন সেগুলিও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঢঙে ধ্রুপদাঙ্গের। যদুভট্ট, রাধিকা গোস্বামীও ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের একে একে দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উপাসনার জন্য যে ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন তাও ধ্রুপদাঙ্গের। কবিগুরুর রচিত প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীতটি হল "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।"—

একে একে বৈরাগ্য থেকে ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ এবং তারও মর্ত্য প্রীতির রূপান্তরই হল ব্রহ্মসঙ্গীতের আসল কথা।

সুরের দিক থেকে ব্রহ্মসঙ্গীতকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(১) পুরাতনী সুর, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় সুর অবলম্বিত ব্রহ্মসঙ্গীত (২) শ্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত, কীর্ত্তন, ঢপ কীর্ত্তন, বাউলের সুর, পাঁচালী, প্রাদেশিক সুর ও পাশ্চাত্য সুরের প্রভাবে রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি খেয়াল ও ধ্রুপদ দ্বারা প্রভাবিত। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ধ্রুপদাঙ্গের। আবার কীর্ত্তন গানের সুরেও ব্রহ্মসঙ্গীত আমরা শুনেছি যেমন—

"ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ
আমি ধর্মের কথা, অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন, মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব।—ইত্যাদি

ব্রহ্মসঙ্গীত পরিপূর্ণরূপ নেয় রবীন্দ্রনাথের গানে। তারপর অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, ডি. এল, রায়ের গানে এই ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারাটি অব্যাহত থাকে।

বাংলায় লোকসঙ্গীত

লোকসঙ্গীত অর্থাৎ গ্রামবাংলার গান বাংলাগানের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ আসন জুড়ে আছে। এই গান এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের কথা ও সুরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। অবিভক্ত বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলায় (অধুনা বাংলাদেশ) যে লোকগীতিগুলির অধিক প্রচলন তার কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদাহরণ সহ দেওয়া হলো—

ভাওয়াইয়া—ভাওয়াইয়া পশ্চিমবাংলার কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমদিনাজপুর, রংপুর (বাংলাদেশ) থেকে শুরু করে আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চল পর্যন্ত

বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিরহ, বেদনা ও বিচ্ছেদের কথাই ধ্বনিত হয়েছে এই গানের মধ্যে দিয়ে। এক কথায় এ গানে নারী হৃদয়ের ক্রন্দনই প্রকাশ পেয়েছে। এ গান উপজাতিদের গান। একটা বিশেষ আঞ্চলিক সুর ও কথায় এ গান রচিত। গায়কীতেও একটা বিশেষ ঢঙ আছে। সুর টানা টানা, বিরহভাবপূর্ণ। কুচবিহারের একটি প্রচলিত ভাওয়াইয়া গানের কয়েকটি কলি—

"ও মোর চান্দ রে, ও মোর সোনা।
মোক ছাড়িয়া না যান দূর দেশান্তরে,
রাইতে সোনা চান্দ উঠিবে,
ভূমি চম্পক ফুটিবে,
তাতে মন মোর হাতাসে ওড়াইবে।"—ইত্যাদি।

চটকা চট্‌কাও ভওয়াইয়া শ্রেণীর দ্রুত ছন্দের হালকা ধরনের গান। এ গানও কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, রংপুর থেকে শুরু করে আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চল পর্যন্ত প্রচলিত। 'চটুল' কথা থেকে চট্‌কা কথা এসেছে। লঘু ছন্দের দ্রুত চালের চটুলতার ভাবাবেগে এই গান গাওয়া হয়। প্রেম বিষয়ক গান ছাড়া ও বিভিন্ন সমাজ চেতনার কথাও পাওয়া যায় হালকা এই চট্‌কা গানে। রংপুর গ্রামাঞ্চল হতে সংগৃহীত একটি চট্‌কা গান হল —

"হাত ধরিয়া কও কন্যারে,
কন্যা না করেন আর গুসা,
তোমার বাড়ী যাইতে কন্যা পায়ে পাড়ল ফুসা" — ইত্যাদি।

বাউল--বাউল দেহতত্ত্ব বা তত্ত্বমূলক গান এক বিশেষ ধরনের সাধক সম্প্রদায়ের গান। বাউলদের সাধনা বহু প্রাচীন। পুরানো বাউল গানগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাউল গানের মধ্যে যে হেঁয়ালী বর্তমান তা প্রাচীন বৌদ্ধ দোঁহা বা চর্যা পদের সঙ্গে অনেকাংশে মিল আছে। বাউল দর্শনে বাঙালীর ধর্মসাধনার মরমের বাণী আছে। একতারার ঝংকারের অনুরণনে বাঙালীর হৃদয় তন্ত্রীর মধুর সুর ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। ধর্মের গন্ডী ছাড়িয়ে এরা মনের মানুষের অন্বেষণ করে বেড়ায়। এদের সাধনার আশ্রয় হলো তাদের গান। বাউল সাধনা সহজ পথের সাধনা। হিন্দু ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের মিলন সাধনার ধারাও সুফী মতবাদের মধ্যে দিয়ে বাউল গানে এসে মিশেছে। বাউলদের সাধনা দেহকে কেন্দ্র করে। তান্ত্রিক বাউলদের ক্রিয়াকর্ম এই দেহকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। বাউলদের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, যথা ঃ—তান্ত্রিক বাউল, সাধক বাউল, কর্তাভজা বাউল, বৈষ্ণব বাউল, গৌর বাউল, দরবেশী বাউল, ইত্যাদি। বাউল দর্শন সাধারনতঃ গুরুবাদ, সহজিয়াবাদ, ও শূন্য বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। লালন ফকির, গগনহরকরা, মদন বাউল, ফিকির চাঁদ, দীনবন্ধু, নবনীদাস, ও শ্রীহট্ট জেলার হাছন রাজার বাউল গান সমধিক প্রচলিত। লালন ফকিরের একটি বাউল গানের নমুনা—

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মন বেড়ী দিতাম তাহার পায়।"—ইত্যাদি।

নিমাই সন্ন্যাস—এক সময় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিরস জনসাধারণের চিত্ত প্লাবিত করেছিল। নিমাইয়ের গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণ, শচীমাতার পুত্রশোক, বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামীশোকের বেদনা,মানুষের মনকে আলোড়িত করেছিল। নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণকে কেন্দ্র করে যে গান লেখা হয়েছে তাই হল নিমাই সন্ন্যাস। বহু প্রচলিত একটি "নিমাই" সন্ন্যাস গানের দুটি কলি—

"সন্ন্যাসী বানাইলো তোরে কে
সোনার বরণ গোহুর চান্ রে।"—ইত্যাদি।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গান—বাঙালীমাত্রেই এই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গানের সঙ্গে পরিচিত। গ্রামাঞ্চলে এই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা রাধাকৃষ্ণ ও গৌর, বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে নানা ধরনের গান বেঁধে থাকে। বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদেব কথা ধ্বনিত হয় এই গানে। একতারা, দোতারা অথবা শুধু খোল করতাল সহযোগে এই গান এঁরা গেয়ে চলে। একটি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের গানের দুটি কলি—

"হৃদয় পিঞ্জরে বসি, রাধাকৃষ্ণ নাম জপনা,
ঐ নাম তুমি বল আমি শুনি ঐ আমি বলি তুমি শোনো নাম'—
ইত্যাদি।

ভাটিয়ালী—পূর্ববাংলার ভাটিয়াল মূলুকের গান বলে এই গান 'ভাটিয়ালী নামে পরিচিত। মাঝিদের কণ্ঠের একক গান হ'ল. ভাটিয়ালী বাংলার প্রধান লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাটিয়ালী অন্যতম। সমগ্র বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় (অধুনা বাংলাদেশ) প্রচলিত প্রায় অধিকাংশ লোকসঙ্গীতের উপর এই ভাটিয়ালী গানের প্রভাব পড়েছে। কেহ কেহ মনে করেন ভাটি শব্দ থেকেই 'ভাটিয়ালী' কথা এসেছে। ভাটির টানে নৌকা বেয়ে চলে, মাঝি তার মনের আনন্দে এই গান গায় বলেই ভাটিয়ালী গানের ওইরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বিরহ, ব্যথা, দুঃখ নিয়েই এই গান তৈরী। এই গান আবেগ ধর্মী ও রোমাণ্টিক, কোনো বাঁধা তাল সাধারণত এই গানে থাকে না। যদিও বা থাকে তা খুব টানা টানা। একটি ভাটিয়ালী গানের কয়েকটি কলি -

"ওরে ও বলদা নাইয়া,
ভবনদী কেমনে যাবি বাইয়া,
ঝড় তুফানে ওঠে রে নাও হেলিয়া দুলিয়া,
ওরে সামাল সামাল ধররে পাড়ি
গুরুর নামটি লইয়া।"—ইত্যাদি।

সারি—সারিবদ্ধভাবে বা একত্রে কর্মরত হয়ে যে গান গাওয়া হয় তাকে সারি গান বলে। তবে 'নৌকা বাইচ'-এর গানই প্রধান সারি গানের অন্যতম। 'নৌকা বাইচ' খেলা একটি উদ্দীপনা মূলক নৌকা প্রতিযোগীতার খেলা। নদী মাতৃক বাংলা বিশেষ করে পূর্ববাংলায় (অধুনা বাংলাদেশে) প্রায় ২০। ২৫ খানা নৌকা একসঙ্গে বৈঠা বেয়ে সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে মাঝিরা এই বাইচের খেলায় যোগদান করে। এই ধরনের একটি সারি গানের দুটি কলি—

"সুন্দইরা মাঝির নাও উজান চলে ধাইয়া,
আগায় পাছায় নিশান ওড়ে, নেয় যুবতীর মন কাইড়্যা"—ইত্যাদি

মুর্শীদা

'মুর্শীদ' অর্থ হ'ল গুরু। সুতরাং মুর্শীদা গান হল ইসলামিক গুরুবাদী সঙ্গীত। সমগ্র বাংলায় এই ইসলামিক গুরুবাদী লোকসঙ্গীত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। বাউল, ফকীর, ও দরবেশীদের কণ্ঠে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এই গান। একটি বহুল প্রচলিত মুর্শীদা গানের কয়েকটি কলির উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

মুর্শীদ আমায় ফেল না
চরণে ঠাঁই দাও না
আমি পদে পদে অপরাধী
আমার বাদী রিপু ছয় জনা।
.... ইত্যাদি।

গম্ভীরা

পশ্চিমবাংলার মালদহ জেলার প্রধান লোকসঙ্গীত গম্ভীরা। 'গম্ভীর' অর্থ মহাদেব। তাই গম্ভীরাও শিবের গানের একটি ধারা। গাজন, নীল, গম্ভীরার মতও গম্ভীরা শিবের গান। মালদহের গম্ভীরা উৎসব চৈত্র মাসের শেষে শুরু হয়ে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চলে। এই উপলক্ষ্যে একটি মণ্ডপ তৈরী করে শিব পুজোর ব্যবস্থা করা হয়।

গম্ভীরার উৎসব অনুষ্ঠান প্রধানতঃ ৪দিন ধরে চলে। প্রথমদিনকে বলা হয় 'ঘটভরা'। দ্বিতীয় দিনে হয় 'ছোট তামাসা'। তৃতীয় দিনে উদযাপিত হয় 'বড় তামাসা'। ঐ দিনে ভক্তেরা অতি শুদ্ধচিত্তে ও শুদ্ধাচারে কাটাভাঙ্গা ও ফুলভাঙ্গা পর্ব শেষ করেন। ফুল ভাঙ্গা পর্বে সঙ বের হয়। ঐ দিন রাত্রে গম্ভীরা মণ্ডপের সামনে মুখোস পরে চামুণ্ডা, কালী, নরসিংহ নৃত্য দেখান হয়।

চতুর্থ দিনে রাত্রে গম্ভীরা গান গেয়ে 'বোলাই' শুরু হয়। গানের ভাষা আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসঙ্গীতের সুর অবলম্বনে রচিত। গানের বিষয় বস্তুকে 'মুন্দা' বলে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রঙ্গ-রস ফুটে ওটে।

গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে বিদ্রূপ করে নানাধরনের সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতির কথা ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। সঙ্গে বাজে ঢোল ও কাঁসি। বহুল প্রচলিত একটি গম্ভীরা গানের কয়েকটি কলি দেওয়া হল -

ভোলা বেশ ভালত মজা
এ কেমন তোমার পূজা।
করলি ভ্যাকমু এ কি রকম
ঠিক যেন ভ্যাক ভ্যাকুম বাজা
… ইত্যাদি।

টুসু

পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড, বাঁকুড়া, পশ্চিমবর্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূমের দক্ষিণাংশের মেয়েরা টুসু পুজো করে. নানা ধরনের গান গায় সারা পৌষমাস ধরে। 'টুসু' কৃষি লক্ষ্মীরই নামান্তর মাত্র। টুসু মূর্ত্তি অনেকটা মেয়ে পুতুলের মত দেখতে—পরণে নীল বা লাল কাগজের শাড়ী। মাথায় থাকে রাংতার মুকুট। হাতে ও গলায় সোনালী রাংতার গয়না : মকর সংক্রান্তির দিন উৎসবের শেষ হয় টুসু ভাসান পর্বের মাধ্যমে। টুসু গানগুলি আঞ্চলিক ছড়া কাটার সুরে গায় মেয়েরা। সীমান্ত বাংলায় একটি প্রচলিত টুসু ভাসানের গানের দু'টি কলি—

আমার টুসু ধনে বিদায় দিব কেমনে
মাসাবধি টুসু ধনকে পূজেছি যতনে।
……ইত্যাদি।

ভাদু

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার নিজস্ব আঞ্চলিক সঙ্গীত হল ভাদুগান। সারা ভাদ্রমাস ধরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের দক্ষিণাংশের মেয়েরা এই গান গায়। সাঁওতাল ও আদিবাসীদের সুরও কোথাও কোথাও পাওয়া যায় এই গানে। একটা নতুন পাত্রে গোবরের উপর ধান ছড়িয়ে মাটির প্রতিমা গড়িয়ে ভাদু পূজা করে গ্রামের মেয়েরা তাদের মেয়েলী বাসনার কথা ব্যক্ত করে ছড়া-কাটার সুরে এই গান গেয়ে থাকে।

ঝুমুর

সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের শাল-পিয়াল-মহুয়া বনের মিষ্টি সুর এসে ধরা দেয় আদিবাসী ও সীমান্ত বাংলার অন্যান্য অধিবাসীদের এই ঝুমুর গানে। আদিবাসীর ছেলে-মেয়েরা নৃত্য সহযোগে এই ঝুমুর গান গায়।

কীর্ত্তন ও আদিবাসীদের সুরের মিশ্রণে বাংলা ঝুমুর গান শোনা যায়। এসব গানের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিচ্ছেদ নিয়ে রচিত। এই ধরনের এই ঝুমুর গানের কয়েকটি কলির উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল—

কিস্টো কালার কীরূপ দেইখ্যে
রাধা পাগল হ'ল্য।
কালো রূপের কী রূপ দেইখ্যে
প্রেমে যে মজিল।

গানগুলি আঞ্চলিক ঢঙে গাওয়া হয়। মাদল ও বাঁশী এর সংগে বাজে।

ধামাইল

ধামাইল শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ নৃত্য সহযোগে গান। যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিবাহ উৎসবে এ গানের প্রচলন বেশী। বিবাহের শুরুতেই স্ত্রী আচারের সঙ্গে সঙ্গে এ গান যুবতী মেয়েদের কণ্ঠে শোনা যায়। শ্রীহট্ট জেলায় (অধুনা বাংলাদেশ) বিবাহের পরও এ গান চলতে থাকে। যুবতী মেয়েরা দুহাতে তালি বাজিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে এ গান গায়। গানের বিষয় বস্তুতে রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেমের কথা শোনা যায়। বহুল প্রচলিত একটি ধামাইল গানের কয়েকটি কলির উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল।

"একদিন বাক্যছলে কয় কুটিলায়,
রাস্তাঘাটে চলা যায় না
ভূতের বড় ভয় হইয়াছে।
সেদিন গিয়াছিলাম জলের ঘাটে
বউরে তোমায় পাইল ভূতে
সে যে শনিবারের সন্ধ্যাকালে
আসতো মোদের তেঁতোই গাছে।
.. ইত্যাদি।

বিয়ের গান

সামাজিক আনুষ্ঠানিক গীতির মধ্যে বিয়ের গান শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়ের গান প্রচলিত। এ ছাড়াও পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাও, মুণ্ডা, মাহাতো, হাড়ি, বাগ্দী ও বাউরিদের মধ্যেও এ গান প্রচলিত। বিয়ের গান আসলে মেয়েলী গান। স্ত্রী আচারের মধ্যে দিয়ে এ গানগুলি গীত হয়। বিয়ের গানকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন – বর-কনে সাজানো গায়ে হলুদ, পাশা খেলা, জলভরা ইত্যাদি।

পূর্ববাঙলা অধুনা বাংলাদেশের বিয়ের গানের বিষয়বস্তু সাধারণত, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ বা শিব দুর্গার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়। এক বিশেষ মেয়েলী গানের সুর ও ঢঙে গীত হয়ে এ গান এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করে। এমনি একটা বিয়ের গানের কয়েকটি কলির উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল—

"আইজ রামেব অধিবাস কাইল রামের বিয়া গো কমলা
আমরা জল ভরিতে যাই, সই আমরা জল ভরিতে যাই।"
… ইত্যাদি

ধানকাটার গান

কর্মসঙ্গীতের মধ্যে ধানকাটার গান এক উল্লেখযোগ্য লোকগীতি। এ গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ধানকাটার মরসুমে এ গান মহা উল্লাসে গেয়ে থাকে। পূর্ব বাঙলায় (অধুনা বাংলাদেশ) এ গানের প্রচলন বেশী। ধান কাটার একটি গানের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল—

ধান কাটি কচাকচ্
মাথায় নিয়ে ধানের আঁটি
ফিরব বাড়ি মচামচ্।
… ইত্যাদি

করম পরবের গান

করম উৎসব ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের বর্ষাশেষের উৎসব। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এ উৎসব উদযাপিত হয়। পশ্চিমবাঙলায় বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও চব্বিশপরগণায় সাঁওতাল, মুণ্ডা ও ওঁরাও জাতির মধ্যে এই করম উৎসব পালিত হয়। ফসলের প্রচুর ফলনের কামনাই এই উৎসবের তাৎপর্য।

একটা খোলা জায়গায় কদম্ব গাছের ডাল পুঁতে তার চারপাশ ঘিরে স্ত্রী-পুরুষ নাচ গানের মাধ্যমে এই করম উৎসব পালন করে। এই ডালটিকে বলা হয় করম রাজা।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েদের কণ্ঠে এ গান শোনা যায়।

হোলির গান

বৃন্দাবনের গোপিনী পরিবেষ্টিত রাই-কানুর হোলিখেলাকে কেন্দ্র করেই এ হোলি গান রচিত। হোলিরগান লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত হলেও অনেক বেশী পরিশীলিত। হোলির গান পূর্ববাঙলায় (অধুনা বাংলাদেশ) সর্বাধিক প্রচলিত। একটি প্রচলিত হোলি গানের কয়েকটি পংক্তি দেওয়া হল—

"নাকের উপরে লাল বেসর দিব
প্রাণনাথ বন্ধুরে আজি রমণী সাজাব
লাল শাড়ি পরাব পীত ধড়া খসাব
নারী হইয়ারে। ... ইত্যাদি

বাংলা হাসির গান

বাংলা সঙ্গীত ভাণ্ডারের হাসির গান নগণ্য নয়, হাসির গান বলতে ব্যঙ্গাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক গানকে বোঝা যায়, বাংলা লোকসঙ্গীতে এবং মৈমনসিং গীতিকার পালাগুলিতে নিছক হাস্য রসের তাগিদে কতকগুলি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। সরল ও সহজ ভাষায় গ্রাম্য কবিরা সেই সব চরিত্র অংকন করেছেন। এছাড়াও গ্রাম্য গানেতে বৃদ্ধের সাথে যুবতীর বিবাহ বা বাসরের গানগুলিতেও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। নাতির বিয়েতে ঠাকুমা সেজেছেন, সেই উপলক্ষে কোন এক নিরক্ষর গ্রামীণ কবি গান লিখেছেন—

"তোরা দেখিয়া যা আইস্যে
নাতির জামাই দেইখ্যা বুড়ী
ঠসক্ ধইর‍্যাছে।"
......ইত্যাদি।

আর একটি লোকগীতিতে আমরা এই ধরনের সরল হাস্যরসের সন্ধান পাই। কোন একটি যুবতী কন্যার সাথে এক বৃদ্ধের বিবাহ হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে নববধূ

বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে অনুমতি চাওয়াতে বৃদ্ধ স্বামী তার যুবতী স্ত্রীর প্রতি যে সোহাগ দেখিয়েছে, তা সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে একটি গানে। যেমন—

"চোন্দনিহার বিবি আমি করল ঘরনী
বাপের বাড়ি 'নাইওর' যামু
'নাইওর' যাইতে দিবা নি।"
নাইওরের কথা শুনলে পরে
আঁচল ধইর‍্যা কান্না ধরে
বুঝাইয়া কই—কাইল ফিরিব,
কাইন্দ না আর তুমি।"—ইত্যাদি।

বাংলা লোকসঙ্গীতে এই ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ বহু ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে মালদহের গম্ভীরা ও রাঢ়ের টুসু গান উল্লেখযোগ্য। এইসব গানে সামাজিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যায় ব্যঙ্গ ছলে।

বাংলা গানের জগতে Parody গানের চল আগে থেকেই ছিল। বাংলায় প্রথম Parody গানের রচয়িতা হলেন আজু গোসাঁই। শাক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের গানকে ঘিরেই আজু গোসাঁইয়ের Parody গান রচিত হয়েছে। রামপ্রসাদের বিখ্যাত গান "আমায় দে মা তবিলদারী", গানটির [illegible] গান রচনা করলেন আজু গোসাঁই —"কেন চাস ভাই তবিলদারী, ও কাজে ভারি ঝুঁকি ভার।"
দুদিনকার মুহুরী হয়ে ভাইবে এত বাড়াবাড়ি।

পেলে তবিল, ভাঙতে একদিন,
তোমার আর সবেনা দেরী। ইত্যাদি।

এরপরে দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, নজরুল ইসলাম প্রমুখ স্বনামধন্য গীতিকারদেরও রচনায় আমরা অনেক হাসির গান পেয়েছি পরবর্তীকালে।

আধুনিক যুগেও বিভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত অনেক হাসির গান রচিত হয়ে চলেছে।

নাটকের গান

আমরা বাংলা নাটকের গানের পূর্বে গ্রাম্য যাত্রায় বিবেকের মুখে ও অন্যান্য চরিত্রেও গান গাইবার রীতির প্রচলন দেখেছি। পরবর্তীকালে রঙ্গমঞ্চেও বিভিন্ন নাটকের গান পরিবেশিত হল। সঙ্গীতমুখর নাটকও বহু সেকালে রচিত হয়েছে। কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখ যাত্রায় কীর্তনভাঙ্গা গান প্রবর্তন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাগরাগিণীকে ভিত্তি করে যাত্রা, নাটকে গানের সৃষ্টি হল।

তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে—'বিদ্যাসুন্দর পালা'। সেই বিদ্যাসুন্দর পালাতেও অভিজাত ও লৌকিক সুরের মিশ্রণ ঘটল। এরপর গিরিশ ঘোষ রচিত বহু নাটক গান সম্বলিত। আগেকার ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক বা রঙ্গমঞ্চে নেমেছে তার মধ্যে অধিকাংশই সঙ্গীত সমৃদ্ধ। এ কালেও সঙ্গীত মুখর নাটক আধুনিক সামাজিক পটভূমিকায় নাট্যমঞ্চ ও সিনেমায় দেখানো হচ্ছে ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

স্বদেশী গান

স্বদেশী গান বাংলা সঙ্গীতের জগতে এক বিরাট আসন জুড়ে আছে।

দেশের ভৌগলিক সীমা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সব কিছু মিলেই স্বদেশ। যে গানে দেশবাসীর মনে দেশের ও দশের প্রতি ভালবাসা জাগায়, স্বদেশের প্রতি মমত্ব বোধ তুলে ধরে—জাতির গৌরবময় ইতিহাস বার্ণিত হয়, একতার সৌধ গড়ে তোলে, মহৎ কার্যে আত্মোৎসর্গের আহ্বান দেয় তাই হল স্বদেশী বান।

আমাদের দেশে স্বদেশী গানের সৃষ্টি মূলত: স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে—দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে।

মুসলমান আমলে ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লেও, বিদেশী শাসক ইংরেজ আমলের মত দেশবাসীর মনে পরাধীনতার অনুভূতি দানা বাঁধেনি—কারণ মুসলমান নবাবগণ বিদেশী হয়েও ভারতের এক দেহে প্রায় মিশে গিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসক পুরোপুরি স্বতন্ত্র। ইংরেজ আমল থেকেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতার সূত্রপাত হয়েছে এবং ইংরেজ-কুশাসনই স্বদেশী সঙ্গীতের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

বাংলা স্বদেশী সঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্র-লাল-নজরুলের দান অপরিসীম। এছাড়া ছোট-বড় বহু গীতিকার ও কবি বাংলায় বহু স্বদেশী গান ও কবিতা লিখে বাংলার স্বদেশী সংগীতের ভান্ডারকে ভরিয়ে তুলেছেন। এঁরা সবাই তাঁদের গানে জন্মভূমির রূপ বর্ণনা করে দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রীতি জাগিয়ে তুলেছেন—আমাদের কীর্তি-কাহিনী তুলে ধরে দেশের গৌরব কথা বলেছেন। 'বন্দেমাতরম্' গানে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃবন্দনায় দশদিক মুখরিত করেছেন। 'স্বাধীনতা হীনতার কে বাঁচিতে চায়' গানটিতে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় পরাধীনতার স্বরূপ তুলেধরেছেন। কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদার "আয় আজি মরিব কে" ? গানটিতে বিদেশী শাসনকে উচ্ছেদ করবার জন্য দেশবাসীকে সোজাসুজি আহ্বান জানিয়েছেন।

কবিগুরু রচনা করলেন আমাদের জাতীয় সংগীত "জনগন মন"। এরপর রবীন্দ্র-

নাথ ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের সময় লিখলেন বহু স্বদেশী গান। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্য পুষ্পেভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', অতুলপ্রসাদের 'বল বল সবে', উঠগো ভারত লক্ষ্মী', রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', 'আমরা নেহাত গরীব', নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'মোরা একই বৃন্তে দু'টি ফুল', 'এই শিকল পরার ছল' কারার ঐ লৌহ কপাট, ইত্যাদি গানগুলি আজও দেশবাসীর কাছে অমর হয়ে আছে।

এছাড়া, দেবেন্দ্র নাথ সেনের—'হিন্দু মুসলমান হয়ে একপ্রাণ এস পুজি মায়ের চরণ', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চরকার গান', 'কোন দেশেতে তরুলতা', হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়', মাইকেলের 'পুনঃ কি হয়বে শুক্লতে ভারত শশী', গোবিন্দ রায়ের 'কতকাল পর ভারত রে', নবীন সেনের 'এ নহে আর্যাবর্ত', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জাগিল ভারত দুঃখিনী', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্বদেশী গান।

ক্ষুদিরামের 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' একদিন বাংলার গ্রামে-গঞ্জের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ফিরত এবং আজও ফেরে। বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার গান দেশ জুড়ে আলোড়ন এনেছিল।

বাংলায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯৩০এর আইন অমান্য আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের স্বদেশী সঙ্গীত রচনা হয়েছে। এছাড়া গ্রাম বাংলার নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত কবিদেরও বহু লোকগীতিতে স্বাদেশীকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। গম্ভীরা ও টুসু গানগুলি অনুধাবন করলে লোকগীতির স্বাদেশী-কতার চিত্রটি পুরোপুরি ধরা পড়ে।

উনবিংশ শতকের বাংলা গান

রাগপ্রধান গান

রাগ অবলম্বন করে গান রচনা আধুনিকবাংলা গানের প্রচলনের আগেও আমরা বাংলা গানের ইতিহাসে দেখেছি। সবাই জানি যে, পূর্বে বাংলা গানের ভিত্তিভূমি ছিল এই 'রাগ সংগীত'। ধ্রুপদ ও টপ্পা গানের প্রভাবে বাংলা গানের রচনার কথা আমরা আগেই পেয়েছি। তবে খেয়াল ও ঠুংরীর ভঙ্গী অবলম্বনে বাংলা গানের রচনা অপেক্ষাকৃত নতুন পদক্ষেপ।

রাগপ্রধান গানের সঙ্গে সেই যুগের রাগ ভিত্তিক গানের তফাৎ কোথায়? 'রাগপ্রধান' নামকরণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে রাগ ভিত্তিক বাংলা গানের সঙ্গে এই 'রাগপ্রধান' গানের ভঙ্গি ও কায়দায় যে কিছু তফাৎ আছে— তা বোঝান।

কলিকাতা বেতারে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় রাগভিত্তিক গানের প্রকারের যে পরিকল্পনা সুরু করেছিলেন বেতার মারফৎ, সেই থেকেই বোধ হয় 'রাগপ্রধান' কথাটি চলে আসছে। গানের মধ্যে শুধু রাগের রূপ সৃষ্টি করাই মূল কথা নয়, তার গায়কীতেও রাগরূপটিও শৈলীর সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

সেকালের টপখেয়াল গানের মধ্যে টপ্পার রূপটি পরিস্ফুটিত ছিল। আলাদা টপ্পার গীটকিরীর প্রয়োগ ছিল গানের মধ্যে। পরবর্তীকালে খেয়ালের প্রচলনের পর বাংলা গানেও খেয়ালের ধারা তার গায়কীতেও আনা হয়েছিল। ঠুংরীর বেলাতেও সেই একই কথা। মোটামুটি একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খেয়াল ঠুংরীর নানা কায়দা বাংলা গানে এসে মিশে যায়।

সেই সময় বেতারে প্রচারিত 'হারামণি' অনুষ্ঠানের ভার দেওয়া হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামকে। উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নজরুল বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগ অবলম্বনে বাংলা গানের প্রচার করেন সুরেশ বাবুর তত্ত্বাবধানে। বেতারের 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানটিও রাগাশ্রিত বাংলা গানের ছিল। শোনা যায় কাজী নজরুল রাগভিত্তিক এই ধরনের বাংলা গান রচনা করতে গিয়ে কিছু কিছু নতুন রাগের সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবিকই তিনি নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন কিনা এ বিষয়ে মতান্তর থাকলেও এ কথা জোর করে বলা যায় যে কাজী নজরুল তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে অর্থাৎ খেয়াল ও ধ্রুপদের প্রচলিত ঢংকে ডিঙিয়ে নতুন সৃষ্টির পথে পা বাড়িয়েছিলেন। নজরুলের এই বিশেষ রাগ বানানোর প্রচেষ্টাটি গতানুগতিকতা থেকে মুক্তির সন্ধান দেয়। নজরুলের এই পদক্ষেপ নতুন সৃষ্টির পদক্ষেপ।

'রাগপ্রধান গানে সব সময় যে রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে এমন কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। গানকে অপেক্ষাকৃত শ্রুতি মধুর করতে হলে রাগপ্রধান গানে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালেও সেটা কিছু অপরাধ নয়-যদি সেটা নতুন ঢং এর নতুন স্বাদেয় রাগভিত্তিক গান হয়।

নজরুলের কয়েকটি রাগপ্রধান গান গেয়েছেন জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী তাঁর মুক্ত-ভঙ্গিতে। নজরুল শুধু তাঁর গানের কাঠামোটি তৈরী করে দিয়েছিলেন কিন্তু শিল্পী তাঁর নিজর ঢং ও গায়কীত সে গান রূপায়িত করে যে যুগে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। তবে একথা সত্যি রাগপ্রধান গানের 'তান' বা ওস্তাদীর মারপ্যাচ করলে গানের বাণীর মর্যাদা অনেকাংশেই ক্ষুন্ন হয়। শিল্পীর সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। প্রসঙ্গত নজরুলের 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর' গানটি উল্লেখযোগ্য। কবি তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে এ গানটি রচনা করেছিলেন। স্বভাবতই গানটি রাগাশ্রিত হলেও করুণ। জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামীর দরাজ কণ্ঠে এবং বিভিন্ন বাঁকেট

তান সহযোগে গানটি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে একালে আমাদের মনে হয় যদি জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী তান বিস্তারের দিকটির বিষয়ে একটু সংযমী হতেন তাহলে গানের ভাবটি আরও বেশী পরিস্ফুটিত হতে পারত।

পরবর্তী রাগপ্রধান গায়ক তারাপদ চক্রবর্তীর বাংলা গানগুলি খেয়ালের হিন্দুস্থানী রীতি ঘেঁষা কিন্তু কথার মর্যাদা রক্ষা করতে শিল্পী তাঁর সুর বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানী হয়েছেন এতে গানের কাব্য-মূল্য ক্ষুন্ন হয়নি। শ্রীমতি দীপালী নাগের গানেও আমরা খেয়ালের রঙ্গিলা ঘরানায় কায়দা লক্ষ্য করে থাকি।

রাগপ্রধান বাংলা গানের আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গানে অভিনব সুর চারণা আমরা লক্ষ্য করেছি। ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, শচীনদেব বর্মনের রাগপ্রধান গান অপেক্ষাকৃত পরিশীলিত হলেও নতুন ধাচের। শচীনদেবের ঠুংরীচালের 'আমি ছিন একা', খোয়ালাঙ্গের 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া এবং মধুবৃন্দাবনে দোলে রাধা গানটি উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে রাগপ্রধান গানের কয়েকটি বিশ্লেষণ করেছেন (১) রাগপ্রধান গান হিন্দুস্থানী খেয়াল গানও নয়, আবেগ বর্জিতও নয় (২) সুর বিশুদ্ধি আর সুর সৌন্দর্যের গঙ্গা-যমুনা সংগম। কিন্তু এই বাহ্য বর্ণনা আবেগটা বড় নয় এবং সুর বিশুদ্ধিতাও প্রকারান্তে বিচার্য নয়।

রাগপ্রধান বাংলা গান স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। রাগাশ্রিত আধুনিক গানের সংঙ্গে এর চারিত্রিক প্রভেদ দেখে তিরিশ দশকের পরে এর নামকরণ হয়েছে রাগপ্রধান।

আধুনিক বাংলা গান

সমসাময়িক প্রবহমান ধারাই যে কোন শিল্পরূপকে আধুনিক করে তোলে। জীবন গতিশীল এবং সঙ্গীত জীবনাশ্রয়ী—তাই তার প্রবহমান ধারা অব্যাহত থাকবে। আধুনিক গান বাংলা গানের প্রবহমান ধারার সমসাময়িক রূপ। আধুনিক বাঙলা গানে তাই প্রতিফলিত হয় একালের প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ, বর্তমান যুগের বাঙালি-জীবনের প্রতিফলন। আমাদের একালের ভাবনা-চিন্তা তাই আধুনিক গানের কথা ও সুরের রূপে ধরা পড়েছে এবং বিভিন্ন নতুন নতুন সৃষ্ট কায়দার সাহায্যে আধুনিক বাঙলা গান সমৃদ্ধ হচ্ছে। এককথায় বলা চলে আধুনিক বাঙলা গান হল এ যুগের কথা ও সুরের আধুনিক রূপ। প্রতি যুগের সমসাময়িক ভাবাপন্ন রচনাকে সেই যুগের আধুনিক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অতীতের গতানুগতিক ভাবধারায় আমাদের মন ভরে না। তাই আমরা খুঁজে

বেড়াই নতুন সৃষ্টির পথ। জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নতুন রূপে, নতুন রসে ধরা দেয় আধুনিকতার মাধ্যমে।

আধুনিক গান সমসাময়িক মনভাবের ধারক। তাই যে-কোন কালের গান সে কালের আধুনিক কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে কথাটা পুরোপুরি না হলেও মোটামুটিভাবে সত্য। নিধুবাবুর টপ্পা এক সময় সেকালের আধুনিক বাংলা গানের পর্যায়ে ছিল। তখন এটিই ছিল বাঙলা গানের আধুনিক রূপ। বর্তমান আধুনিক গানে এসেছে বিভিন্ন দেশের সুরের মিশ্রণ। নতুন উদ্ভাবিত স্বর-সমন্বয়, নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের চেষ্টা, টুকরো টুকরো বিচিত্র সুরের সংযোজন আর অত্যাধুনিক আবাহসংগীতেরও সংযোজন। দেশী বিদেশী সংগীত যন্ত্রের ব্যবহারও লক্ষ্যণীয় একালের গানের সঙ্গে। একশ বছর আগের নিধুবাবুর গান সেকালের আধুনিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাচীন বা প্রচলিত দেশী সংগীত রীতিকে অবলম্বন করে। কিন্তু একালের আধুনিক গানেতে দেশী বিদেশী সুরের মিশ্রণ হচ্ছে। শুধু সমসাময়িক সৃষ্টি বলেই এ গানের নাম আধুনিক নয়। এ হচ্ছে আধুনিক নামক একটি বিশিষ্ট সংগীতরীতি যার সৃষ্টি এ যুগেই। একালের সংগীত রসিক ও সংগীত প্রেমিদের মনের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী এই আধুনিক গান সৃষ্টি হচ্চে। আধুনিক গানের দুটো অংশ। এক হচ্ছে তার বাণী অপর হচ্ছে তার সুর। বাণী বা রচনার কথা বলতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে সমস্ত রচনাই কি গানে হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ? সব কবিতাই গান হতে পারে না। শুধুমাত্র গীতিকবিতাই সঙ্গীতেরপক্ষে উপযুক্ত। এই সব প্রশ্নেরসঠিকবিশ্লেষণ নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। গীতিকবিতাকে আমরা বলি লিরিক। বর্তমানে আধুনিক গান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সবগুলিই লিরিক বা গীতি কবিতা নয়। সুরসংযোজনের পক্ষে বা সার্থক গান তৈরী হবার পক্ষে গীতিকবিতাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ গীতি কবিতার ছন্দের মিল, শব্দের প্রয়োগ, রচনার কাব্যিক রূপ সবকিছুই সুর সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক। তবু একালের বাংলা গানে গীতিকবিতা, কাহিনী মূলক কবিতা এমনকি গদ্য-কবিতাও কোন কোন ক্ষেত্রে সার্থক আধুনিক গানে পরিণত হয়েছে। এই গীতি কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে ভাব সংলিপ্ততা, সরলতা আছে ও আইডিয়ার বা ভাব বিশেষের পরিপূর্ণতা নিয়েই এরা রচিত। আধুনিক গানের বিষয় বস্তু রোম্যান্টিক এবং গীতিকবিতায় সুর সংযোজনের পর যখন সার্থক একটি গানে পরিণত হয়, তখন তার প্রথম কলিটি বিশেষ বিশেষ গানকে উপভোগ্য করে তোলে। তারপর অন্তরা বা সঞ্চারীর আবেদনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আরও বেশী নিবিড়তার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সার্থক গানের রূপটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। সুর প্রয়োগের ফলে এবং ছন্দ তাকে আরও রসাপ্লুত করে তোলে। আধুনিক গানের একালের বিভিন্ন ধরনের

কবিতাকে সুর প্রয়োগ করে তাকে একটি পরিপূর্ণ গানে পরিণত করার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষা চলেছে। সেই পরীক্ষা—নিরিক্ষা কোন ক্ষেত্রে সফলতার রূপনিয়েছে আবার কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থও হয়েছে।

কবিতা ছন্দোবন্ধ হলে তাতে সুর প্রয়োগ করে গাওয়া চলে। বর্ণনামূলক বা কাহিনীমূলক ভাষাতেও সুর প্রয়োগ চলে। তাই গীতিকা বা গাথাগুলি সুর প্রয়োগে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কবিতাকে সুর প্রয়োগের দ্বারা কত সুন্দর করা যায় তা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই বাংলাগানে সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন। কবিগুরু 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে', 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' ইত্যাদি গানগুলিতে এই ধরনের গাতানুগতিক ধারা থেকে সরে গিয়ে নতুন পথের সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতের মাধমে। ধ্রুপদ গানের ভাব-গাম্ভীর্য, বাউল, কীর্তন ও অন্যান্য লোক সংগীতের সুর, বিদেশী সুর ইত্যাদি সব কিছু মন্থন করে নতুন আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভাবলে সৃষ্টি করলেন রবীন্দ্র সংগীত। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বাংলা আধুনিক গানের পথিকৃত বলা চলে।

আধুনিক গানের পূর্ব যুগে—বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গানের যে সব শ্রষ্টা বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা একাধারে গীতিকারও সুরকার ছিলেন। এ যুগটিকে রবীন্দ্র দ্বিজেন্দ্র-রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের যুগ বলা চলে। এঁদের সমৃদ্ধ গীতিরচনার ধারার সঙ্গে আধুনিক গানের নতুন নতুন পরীক্ষা নিরক্ষা চালিয়ে সফলতার পথে পা বাড়ালেন কাজী নজরুল ইসলাম। যিনি গীতিকার, তিনিই সুরকার হলে সংগীত সৃষ্টি সার্থক রূপ নেয়। কেননা ভাষায় যিনি তাঁর কাব্যরসকে ফুটিয়ে তুলেছেন, গানে তিনি আবার তাঁর রচনায় সুরারোপ করে সেই গীতিকবিতাগুলিকে আরও রসাপ্লুত করে তাঁর সৃষ্টিকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত বাণীর সঙ্গে সুরের গাঁট ছড়া বাঁধানোর কাজটি তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়।

আধুনিক গানের নতুনত্ব হচ্ছে তার সমকালীন পরিবেশ। এর উপাদান আলদা ধরনেরও কারিগরীতেওনতুন মানসিকতা আছে। অর্থাৎ গানের স্ট্রাকচারের নতুনত্ব আনা রবীন্দ্রত্তর যুগে আধুনিক গানের সফলতার জন্য তিন শিল্পীর ত্রয়ী কারিগরীর উপর নির্ভর করে যথা—'গীতি রচয়িতা, সুরকার ও শিল্পী। রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে যিনি সুরকার তিনিই গীতিকার ছিলেন। আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত অতুল-প্রসাদ, নজরুল ও রবীন্দ্রনাথকেই দেখেছি। তারপর আধুনিক গানে গীতিকার ও সুরকার রূপে এমন একজনেরও উল্লেখ্যযোগ্য নাম আমাদের মনে আসে না। নজরুলের পর আমাদের দেশে যে সব গীতিকার নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন অর্থাৎ যাঁদের লেখা গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তারা হলেন অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, মোহিনী চৌধুরী, প্রণব রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দোপাধ্যায়,

শ্যামল গুপ্ত, সলিল চৌধুরী, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। অজয় ভট্টাচার্য রচিত গানগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই সুরকার হিমাংশু দত্তের সুরারোপিত। সে সব গানের শিল্পীদের মধ্যে শচীনদেব বর্মন, সাবিত্রী ঘোষ, শৈল দেবী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। গানগুলি শ্রোতাদের জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে গানে হিমাংশু দত্ত তাঁর সুর সৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন রাগ সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সংগীত। 'তোমার পথ পানে চাহি" গানটি পাশ্চাত্য সংগীতের কাঠামোয় রচিত হয়েছে।

সুরসাগর হিমাংশু দত্ত

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আমরা বাংলা গানের সুরকার হিসাবে হিমাংশু দত্তকে পাই। তাঁর সুর সং যোজনার ক্ষেত্রে আমরা স্বাতন্ত্র্যর পরিচয় পেয়ে থাকি।

হিমাংশু কুমার কুমিল্লার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর গানের দিকে ঝোঁক ছিল। তাঁর মায়ের উৎসাহে এবং পিতার অনুপ্রেরণায় তিনি সংগীতে মননিবেশ করেন। মা সেকালের একজন সুগায়িকা ছিলেন। কুমিল্লার ধর্মমন্দিরে ভজনগান গেয়ে শোনাতেন হিমাংশু কুমার তাঁর ছেলেবেলায়। স্বভাবতই তারও প্রভাব পড়ে তাঁর জীবনে। লেখা পড়ায়ও ভাল ছিলেন হিমাংশু কুমার। ১৯২৪ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সায়েন্স গ্রাজুয়েট হন।

অল্পদিনের মধ্যেই হিমাংশু দত্তের যশ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তবে তিনি কোন জলসায় গাইতেন না। হিমাংশু কুমারের সুর সাধনা ও সুর সৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে ভাটপাড়া থেকে তাকে 'সুর সাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

হিমাংশু দত্তের ব্যক্তিগত জীবন ছিল বিরহে ভরা। তাই হতাশা তাঁর জীবনে অনেকবারই এসেছে। ১৯৪৪ খ্রীঃ এই প্রতিভাবান সুরকারের মৃত্যু ঘটে।

হিমাংশু দত্তের গানের সুরে কারুণ্য রসের প্রাধান্য বেশী। সে যুগে হালকা গানের কদরের মধ্যেও তিনি তাঁর বিরহাত্বক গানে সুর করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রাগ সংগীতকে ভিত্তি করেই তাঁর সংগীত সৃষ্টি হলেও পাশ্চাত্য সংগীতের কয়েকটি ভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব একটা সুরের ঢং ছিল যার ভিতর দিয়ে তার নিজস্ব ছাপটি ফুটে উঠেছিল। হিমাংশু দত্তর কয়েকটি গান আজও আমাদের মনে নাড়া দেয় যেমন—"বরষার মেঘ নামে, করে বরিষণ।" এছাড়া গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের লেখা শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে গীত "আলোছায়া দোলা", গীতিকার বিণয় মুখোপাধ্যায় রচিত শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠে—"নতুন ফাগুণ যবে" ইত্যাদি গানগুলি হিমাংশু দত্তের সুরকরা 'হিট সঙ'।

গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ হিমাংশু দত্তের সঙ্গীত জীবনের সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িত ছিলেন। হিমাংশু দত্তের নিজের সুর করা যে দুটি গান নিজের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়ে সেকালে জনপ্রিয় হয়েছিল যথা—"ডাক দিয়ে যায় কে গো', 'তব স্মরণ লাগি" এই গান দুটি সুবোধ পুরকায়স্থরই রচনা। নজরুলেরও রচিত কয়েকটি গানে হিমাংশু দত্ত সুরারোপ করেছিলেন। এরমধ্যে "কোন সে সুদূরে অশোক কাননে" গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

হিমাংশু দত্তের সুর ও সঙ্গীত রচনা রাগ নির্ভর, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত। গানগুলি রাগ নির্ভর হলেও রাগ সঙ্গীত হয়নি। অলংকারের ব্যবহার করে হিমাংশু দত্ত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন তাঁর সুরসৃষ্টিতে। তাই তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী দিলীপ কুমার রায় তাঁর এই ব্যবহৃত অলংকারকে বলেছেন—'চূর্ণ সুরের ঢেউ।' খেয়াল ও ঠুংরীর কতকগুলি খণ্ড তান, মীর প্রয়োগ করে তিনি তাঁর সুরসৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ফুটিয়েছেন। হিমাংশু দত্তের সুরে ছিল আবেগ প্রবণতার প্রবাহ—যা আমরা লক্ষ্য করেছি নজরুলের মধ্যে। হিমাংশু বাবুর সুরবোধ ছিল অসাধারণ। সর্বদিক থেকেই তিনি সার্থকতা অর্জন করেছিলেন সন্দেহ নেই। গীত ও শিল্পী নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর ভাবনার সুর সংগতি দেখিয়েছিলেন।

তারই সমসাময়িক আর একজন সুরকার শৈলেশ দত্তগুপ্ত রাগনির্ভরশীল হয়েও বিশেষ সার্থকতা লাভ করেন নাই সুরসৃষ্টিতে। যদিও তাঁর সুরে আমরা ছন্দের গতি ও বিদেশী সুরের প্রভাব লক্ষ্য করেছি, তবুও সামগ্রিকভাবে তাঁর সুরসৃষ্টি হিমাংশু কুমারের মত ছাপ ফেলে না। তবে তাঁর সুকৌশল রীতির প্রশংসা না করে পারা যায় না। নজরুলের সুরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আরও একজন প্রতিভাবান সুরকার বাংলা গানে এসেছেন। তিনি হলেন কমল দাসগুপ্ত। তার সুর সৃষ্টিতে আমারা বিভিন্ন ছন্দের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সহজ ও সরল সুর রচনার মাধ্যমে তিনি আধুনিক বাংলা গান ও ফিল্ম গানে নিজের স্বকীয়তা ফুটিয়েছেন এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রচিত সুরে আবেগের ছাপ সুস্পষ্ট। কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে সুবল দাশগুপ্তের নাম আমাদের মনে পড়ে। তিনিও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কমল দাশগুপ্তের পথ অনুসরণ করেছেন সুর সৃষ্টিতে।

আধুনিক গানের আলোচনায় সুরকার ও শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর নাম চিরস্মরনীয়। শিল্পী হিসেবেও তিনি যেমন বাংলা আধুনিক গানে এক নতুন আবেদন শ্রোতাদের মনে রেখে গেছেন তেমনি তাঁর সুর সৃষ্টিতে আবেগ সবার মনকে নাড়া দেয়। তাঁর সুররচনায় ধারাবাহিকতা আছে অর্থাৎ সঙ্গতি আছে, তিনি অতি অল্প বয়সেই আমাদের এই সংগীত জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তবুও এই ক'বছরে

তিনি যে কয়টি আধুনিক গানে সুর দিয়ে গেছেন তা আজও আমাদের মনে অনুভূতি জাগায় যেমন, প্রণব রায় রচিত, "মধুর আমার মায়ের হাসি",
এবং, "খেলা ঘর মোর ভেঙে গেছে হায়" ইত্যাদি।

তিনি রাগ নির্ভরশীল ছিলেন। স্বকীয় প্রতিভা বলে তিনি বাংলা গানে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক বাংলা গানের চরিত্রটির একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট গানে। সুধীরলালের সুর রচনা, রাগ থেকে সুরকলি সংগ্রহ, ছোট ছোট তানের ব্যবহার আছে তাঁর গানে, সুর ও সংগীত পরিবেশনায় পূর্ণ আবেগের চিত্র তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্যামল মিত্র আধুনিক শিল্পী হিসাবে বাংলা গানের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন। যদিও শ্যামল মিত্র সুধীরলালের গায়কী এবং সুর সৃষ্টির অনুসারী ছিলেন, তবু তাঁর কণ্ঠে ছিল অপূর্ব সুর ও রোম্যান্টিক আবেদন। কণ্ঠস্বরও বৈশিষ্টপূর্ণ। সুর সৃষ্টিতেও তিনি বিভিন্ন ছায়াছবির গানে এবং রেকর্ডের গানে নিজের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এর পরে আমাদের বাংলা গানের আকাশে আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কথায় আসা যাক। তিনি হলেন জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ। একাধারে পারকাসন্ অর্থাৎ চামড়ার বাদ্যযন্ত্রের উপর দখল, অন্যদিকে ভারতীয় রাগিণীর উপর দখল নিয়ে তিনি বাংলা গানের জগতে এসেছেন। শুধুও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের আবহসঙ্গীত সৃষ্টির উপরেও যথেষ্ট দখল আছে। তাই একটা সমষ্টিগত রূপ পাওয়া যায় তাঁর সুরসৃষ্টিতে। আকাশবাণী কলকাতার রম্যগীতি প্রযোজক হিসাবে তিনি কর্মরত ছিলেন বহুদিন পর্যন্ত। তখনই তিনি রম্যগীতির বিভিন্ন গানের মাধ্যমে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছেন সুরসৃষ্টিতে যেমন—(১) যন্ত্র ব্যবহারে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের "হারমোনিকে" এ দেশের মেলডির আনুগত্য রেখে ব্যবহার। (২) সমবেত কণ্ঠের গানে তিনি এক নতুন রূপ দেখিয়েছেন হারমোনির মাধ্যমে। সেখানে তিনি গানের কাঠামোকে রেখেছেন ভারতীয় রাগভিত্তিক কিন্তু আঙ্গিক অর্থাৎ পরিবেশনায় পাশ্চাত্য হারমোনিকে আশ্রয় করেছেন ফলে এক নতুন রসের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি একজন বলিষ্ঠ গীতিকারও বটে। তাই তাঁর বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর কণ্ঠে তাঁর লেখা এবং সুরারোপিত গান গ্রামাফোন রেকর্ড ও আকাশবাণী থেকে শোনা যায়। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য অজয় চক্রবর্তীর কণ্ঠে তাঁর বহু গান স্বার্থক রূপ নিয়েছে। এছাড়া তাল যন্ত্রের নানা রূপ ছন্দ ব্যবহার তাঁর সংগীত রচনার আরও একটি দিক।

নজরুল সমসাময়িক সুরকার এবং শিল্পী হিসেবে অন্য আর একজনের নাম বাংলার সংগীত জগতে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। তিনি হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র দিলীপ কুমার রায়। তিনি একজন খ্যাতনামা গীতিকার, ঔপন্যাসিক, শিল্পী ও সুরকার ছিলেন। বাংলা গানের জগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন দিলীপ কুমার। ভারতীয় রাগরাগিণীর ছোট ছোট তান ও অলংকার তিনি প্রয়োগ করলেন

তাঁর গানেতে এক বিশেষ ঢঙে। সংগীত রসিকরা বাংলা গানে এক নতুন আস্বাদন অনুভব করলেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা উমা বসু, মঞ্জু গুপ্তা, শিষ্য গোবিন্দ গোপাল মুখার্জী এবং কৃষ্ণা চ্যাটার্জীর কণ্ঠে সেই সব গান পরিবেশিত হয় গ্রামাফোন রেকর্ডের মাধ্যমে। বিভিন্ন ভক্তিগীতি, ভজন ও স্তোত্র গ্রামাফোন রেকর্ডে গেয়ে দিলীপ কুমার তাঁর প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন বাংলা সংগীত জগতে।

কমল দাশগুপ্তের নামের সংগে আরও কয়েকজন প্রখ্যাত নামা সুরকারের নামও উল্লেখ্য যেমন অনিল বাগচী, রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাইচাঁদ বড়াল অনুপম ঘটক প্রমুখ। অনিল বাগচী নজরুল সংগীত বিশারদ ছিলেনতাই তাঁর সুর রচনায় নজরুলের প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর সুর রাগ ভিত্তিক হলেও লোক সংগীতের সুর গ্রহণ করেছেন তাঁর সংগীত রচনার ক্ষেত্রে বহু গানে। তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের "কবি" চলচিত্রটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গ্রামোফোন রেকর্ডে ও ছায়াছবির গানে অনিল বাবু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁর সংগীত রচনায়। 'এণ্টনি ফিরিংগী' ছায়া ছবিতে তিনি লোক সংগীতের সংগে রাগ সংগীতকে মিশিয়ে সুর সৃষ্টি করে জনপ্রিয় হয়েছেন।

রাইচাঁদ বড়ালও তাঁর সঙ্গীত রচনায় রাগ নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি 'নিউ থিয়েটার্স" কোম্পানীতে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে বহু ছবিতে স্বুরারোপ করে বাংলা সঙ্গীতের জগৎকে আলোকিত করেছেন। একই সঙ্গে আর একজন প্রতিভাবান স্বুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। সহজ সরল স্বুরের মাধ্যমে ছায়াছবির সিকোয়েন্স অনুযায়ী অপূর্ব আবেগ ধর্মী সুর করে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন রবীনবাবু। উত্তম-স্বুচিত্রার মুখে সে সব গান হেমন্ত, মান্নাদে, সন্ধ্যা, ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে সে গানগুলি আজও আমাদের মনে রেখাপাত করে। তিরিশ বছর পূর্বে সে সব গান 'হিট সং' ছিল। একালেও সে গানগুলি খুবই জনপ্রিয়।

এরই সঙ্গে প্রখ্যাত সুরকার ও গায়ক পংকজকুমার মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য। সহজ ও সরল গতানুগতিক ধারাতে সুরসংযোজনা করেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলা চিত্রগীতির জগতে। তিনি রবীন্দ্র অনুসারী ছিলেন সে যুগের সুর রচনায়। কারণ তিনি সে যুগের প্রধান জনপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাই তাঁর সুর রচনায় রবীন্দ্র প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। তবু রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হয়েও তিনি আকাশবাণী কর্তৃক প্রচারিত "মহিষাশুর মর্দিণী"র মধ্যে বিভিন্ন রাগরাগিণীকে আশ্রয় করে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সাফল্যের উচ্চশিখরে উন্নীত হয়েছিলেন। আজও মহালয়ার দিন প্রাতঃ কালীন এই সংগীতানুষ্ঠান প্রতিটি বাঙালীর মন প্রানে স্থান পেয়েছে। পংকজ বাবু নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীর সংগীত পরিচালক হিসাবে কাজ করে বহু ছায়াচিত্রের গানকে সাফল্য মণ্ডিত ও জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এরপরে শচীনদেব বর্মন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সংগীত জগতে চির অক্ষয় হয়ে আছে। শচীনদেব

বর্মন অসাধারণ গায়ক ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও গায়কীতে এক নতুন চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ আবেদন প্রতিটি বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল তিরিশ, চল্লিশ দশক পূর্বে। তাঁর কণ্ঠে যেমন রাগসংগীতের আমেজ তেমনি লোক সংগীতের আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিদ্যমান। তাই তাঁর গ্রামাফোন রেকর্ড ও চলচ্চিত্রে সুর রচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রাগসংগীত ও লোক সংগীতের কাঠামোয় সংগীত রচনা।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরে বাঙালী সংগীত রসিক সেদিন ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার গায়কীতে চমক উঠেছিল চল্লিশ দশকের ঊর্ধ্বে বাংলা সংগীত জগতে। সাদামোটা কণ্ঠ কিন্তু কি অপূর্ব ও বলিষ্ঠ তাঁর কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ। হেমন্তবাবু তার সংগীত রচনায় রবীন্দ্র অনুসারী হলেও রেকর্ড ও ছায়াছবির গানে অপূর্ব সফলতা লাভ করেন তিনিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাঙলার প্রোথিত যথা শিল্পীদের কণ্ঠে তাঁর সুরের গান এবং ভারতবর্ষের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠে তাঁর সুর দেওয়া গান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাই সে সব গানের অধিকাংশই 'হিট সঙ'।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাঙলার প্রায় সব গীতিকারেরই গানে সুর দিয়েছেন। তবে যে সব গীতিকারের রচনায় বেশী সুরারোপ করেছেন তাঁরা হলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত ইত্যাদি।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বিংশশতকে আধুনিক গানের গীতিকারের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তাঁর গান রচনায় রবীন্দ্র প্রভাব থাকলে স্বকীয়তা আছে। বাঙলার রেকর্ড ও ছায়াছবির গানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার একটি স্মরণীয় নাম। ছবির সিকোয়েন্স অনুযায়ী আবেগধর্মী কাব্যসুষমামণ্ডিত রচনা গৌরী বাবুর। অপূর্ব শব্দচয়ন, তাঁর রচিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপিত তাঁর রচিত গানগুলির অধিকাংশই গ্রামাফোন রেকর্ড ও চলচিত্রে জনপ্রিয় হয়েছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের পর গীতিকার হিসেবে পুলক বন্দোপাধ্যায় ও শ্যামল গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরও রচনায় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে আধুনিক গান রচয়িতাদের মধ্যে কমল ঘোষ, মিন্টু ঘোষ, সুনীল বরণ, শিবদাস বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা গানের জগতে বিংশশতকের প্রথমদিকে নচিকেতা ঘোষ ও সুধীন দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযেগ্য। লোকসঙ্গীতের সুর নিয়ে নচিকেতাবাবু আধুনিক গানের বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। চলচিত্রেও যে সমস্ত গান তিনি সুর করেছেন তার মধ্যে বহু গানই লোকসঙ্গীতের প্রভাবে প্রভাবিত। নচিকেতা ঘোষের সুর আবেগধর্মী এবং সিনেমার সিকোয়েন্সটি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। তাই তাঁর

গানগুলি এত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। হেমন্তবাবুর কণ্ঠে "মেঘ কালো আঁধার কালো" চলচ্চিত্র নবজন্ম' ও 'ভালবাসার' বেশ কয়েকটি গানে তাঁর মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ছায়াছবি ও বিভিন্ন রেকর্ডের গানে সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সুধীন বাবুর সুরে আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে এবং একালের বহু স্বনামধন্য শিল্পী রেকর্ড করেছেন। তাঁর সুরের মধ্যে লোকসঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মধ্যে একটা নতুন শৈলীর সন্ধান পাওয়া যায়। সুধীনবাবুর 'ডাকহরকরা' ছবিতে মান্নাদের কণ্ঠে লোকসঙ্গীতের কাঠামোয় গানগুলি এক সময় খুব হিট করেছিল। অন্যান্য সুরকারদের মধ্যে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় অনল চট্টোপাধ্যায় দিনেন চৌধুরী ও প্রবীর মজুমদারের বেশ কয়েকটি গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে অভিজিতের সুর দেওয়া ছন্দের যাদুকর সত্যেন দত্তের "ছিপ খান তিন দাঁড়, তিন জন মাল্লা" প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

প্রবীরবাবু বা অভিজিৎ বাবুর সুরেও লোকসঙ্গীতের প্রভাবটাই বেশি। এর পরেও ভি. বালসারা, মৃণাল বন্দোপাধ্যায় সুপর্ণকান্তি ঘোষ, অজয় দাস, বিরেশ্বর সরকার, জটিলেশ্বর মুখার্জী, অশোক রায় প্রভৃতি সুরকারদের দুএকটি গান কম বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বাংলা সঙ্গীত জগতের আর একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন সলিল চোধুরী। বাংলা সঙ্গীতের মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দেন সলিলবাবু বাংলা গানের গতানুগতিক ধারাকে ভেঙে দিয়ে নতুন কাব্যসঙ্গীত "গাঁয়ের বধূ" রচনা ও সুর করে বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন। এটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গীত। তারপর সলিলবাবু আরও কয়েকটি লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠে "যা যা উড়ে যা'রে পাখি", "সাত ভাই চম্পা"; হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রাণার অবাক' পৃথিবী এই দুটি কাহিনীমূলক ও আধুনিক কবিতায় সুরারোপ করে সে যুগে আধুনিক গানের জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

সুরকার রাহুলদেব বর্মণ, আশা ভোঁসলে ও কিশোর কুমারের কণ্ঠে কয়েকটি ছায়াছবি ও রেকর্ডের গানের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন—যা অভিনবত্বের দাবী রাখে। বাংলা সঙ্গীতের সার্থকতায় গীতিকার সুরকার ও শিল্পী এই তিনজনেরই দান অনস্বীকার্য। লেখক তাঁর কল্পনাকে বাণীর মধ্যে তুলে ধরেন। সুরকার তাকে গানে রূপায়িত করেন। শিল্পী সেই গানে প্রাণ সঞ্চার করেন। ঊনবিংশ শতকের আধুনিক গানের জগতে এক-একজন শিল্পী তাঁদের কণ্ঠ স্বরের স্বাতন্ত্র্য ও গায়কীর মাধ্যমে বাংলা গানের নতুন নতুন নজীরের সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে বিংশ শতকে যে সব শিল্পী তাঁদের কণ্ঠ মাধুর্যের স্বাতন্ত্র্যের জন্য জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁরা হলেন যুথি কারায়, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ফিরোজা বেগম,

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, নির্মলা মিশ্র, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, আরতী মুখোপাধ্যায়, ডঃ অনুপ ঘোষাল, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, হৈমন্তী শুক্লা, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, অংশুমান রায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কীর্তন অন্যতম বাংলা গানের ধারা। রেকর্ড ও রেডিওতে কীর্তনের গানকে জনপ্রিয় করার মূলে যাঁদের দান অপরিসীম তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমলা ঝরিয়া, রাধারাণী ও ছবি বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। যে সব কীর্তন বিশেষজ্ঞদের প্রচেষ্টায় কীর্তন গান বিংশ শতকে প্রসার লাভ করে তাঁরা হলেন নন্দকিশোর দাস, হরিদাস কর, রজেন সেন, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। লোক গীতির ক্ষেত্রে নির্মলেন্দু চৌধুরী, অমর পালের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের নাম সর্বাগ্রে।

সিদ্ধেশ্বর বাবু ও ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র অবশ্য নজরুল গীতিতেই বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তবু তাঁদের কীর্তনের দান কম কিছু নয়।

বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক বাংলা গানের ধারা চিরকালই অব্যাহত থাকবে। তবে প্রতিভাবান গীতিকার সুরকার ও শিল্পীর আরও বেশী প্রয়োজন বাংলা সঙ্গীতের ধারাকে স্বকীয়তার মাধ্যমে আরও বলিষ্ঠ করার জন্য।

পল্লীগীতি

পল্লীগীতি নামে একধরনের একালের কিছু রচয়িতাদের গান পরিশীলিত গ্রাম্য কথা ও সুরে বাজারে চালু আছে। এ গানগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি থেকে চারিত্রিক গঠনে অনেকটা আলাদা ধরনের। কমার্শিয়াল করে গানগুলি লোকগীতির ছায়ায় রচিত।

এই গানগুলিতে সুরকার ও রচয়িতার একটা যৌথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। গানগুলির কিছু কিছু শহরাঞ্চল থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। যেমন ঝুমুর চালের স্বপ্না চক্রবর্তীর "বড় লোকের বিটিলো" এবং "বলি ও ননদী"; গোষ্ঠগোপাল দাসের ভাটিয়ালী ঢঙে "গুরু না ভজি মুঁই সন্ধ্যা সকালে", অংশুমান রায়ের "দাদা পায়ে পড়ি রে" ইত্যাদি গানগুলি। তবে এই ধরনের কমার্শিয়াল পল্লীগীতিগুলি অধিকাংশই ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়েছে।

গণসংগীত

বিংশ শতকের বাংলা গানের জগতে গণসঙ্গীতের স্থান নিতান্ত সংকীর্ণ নয়।

পরাধীনতার জ্বালায়, ভারতবাসী স্বরাজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল। বিদেশী ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

বিদেশী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির আকাংখা জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। এবং সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় সঙ্গীতের। তাকেই অনুসরণ করে জন্ম নিয়েছে বিজাতীয় এবং জাতীয় শোষন থেকে মুক্তিকামী শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলন এবং সৃষ্টি হয়েছে গণ-সঙ্গীতের। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে স্বদেশী গানগুলি ছিল সে যুগের গণসঙ্গীত। কারণ সে গান যুগিয়েছে দেশবাসীর মনে ইংরেজ শাসন ও শোষন থেকে মুক্তির প্রেরণা। দেশবাসীকে বৃটিশ সৈন্যের বুলেট ও ফাঁসির মুখোমুখি হতে সাহস জুগিয়েছে সেই সব স্বদেশী গান।

স্বাধীনতার উত্তরকালে এই গণসঙ্গীত বিজাতীয় ও জাতীয় শোষন থেকে মুক্তির জন্য শ্রমজীবী মানুষের মনে সাহস ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলন করবার জন্য।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, ক্যালকাটা ইউথ কয়ার ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংস্থা শহর গ্রামে-গঞ্জে এই গণসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রমজীবী মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। গণসঙ্গীত প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গণসঙ্গীতবিদ্ হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন, "গণসঙ্গীত কথাটা অনেক বেশী ব্যাপক। স্বদেশী সঙ্গীত বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বলতে আমরা যা বুঝি, তার সাথে ভাবে ও ভঙ্গিতে একটা পার্থক্য বুঝবার জন্যই গণগীতি বা গণসঙ্গীত শব্দটার উৎপত্তি।......

শ্রমজীবী জনতাই দেশ, তাদের মুক্তি ছাড়া, দেশের মুক্তি অর্থহীন। একথা সেদিনের গানে ব্যক্ত হয়নি। স্বদেশ চেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিলল, সেই মোহনাতেই গণসঙ্গীতের জন্ম।"

বাংলায় গণসংগীত রচয়িতাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাংগ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রগতিশীল কবিদের বেশ কিছু কবিতাকে সুর করে সার্থক গণসংগীতে পরিণত করা হয়েছে। একালের কোন কোন গীতিকারেরও লেখা বেশ কিছু গান জনপ্রিয় গণসংগীত হয়ে উঠেছে। একালের গীতিকারদের মধ্যে পরেশ ধর, শিবদাস বন্দোপাধ্যায়, ও অতীন মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের লেখা বহু গণসংগীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা ও ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের শিল্পীদের কণ্ঠে গ্রামাফোন রেকর্ডে ধরা আছে। এই গ্রামাফোন রেকর্ডগুলির মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের লেখা "অবাক পৃথিবী", এবং 'রাণার,' ভূপেন হাজারিকার গাওয়া "বিস্তীর্ণ দুপারে" এবং "আমি এক যাযাবর" খুবই জনপ্রিয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গীত উপরোক্ত গানদুটির সুরকার হলেন সলিল চৌধুরী। এছাড়া অজিত পাণ্ডের গাওয়া কিছু গণসঙ্গীতও রেকর্ড করা আছে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও ক্রান্তি

শিল্পী সংঘের গাওয়া রেকর্ডগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। তবে ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের পরিবেশিত গণসঙ্গীতের যে কখানি রেকর্ড আছে তা এখনও চালু আছে এবং জনপ্রিয় সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে 'ঘুম্ ভাংগার গান' ও ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের রেকর্ডে গাওয়া গানগুলি সমবেত কণ্ঠের গণসঙ্গীত হিসাবে একটা বলিষ্ঠ প্রয়াস। নিবারণ পণ্ডিত একজন গ্রাম্য গণসঙ্গীত রচয়িতা। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর গান বাংলার গ্রামে গ্রামে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় (বাংলাদেশ) প্রচলিত। তাঁর রচনাগুলি যেমন কাব্যিক তেমনি সমাজ চেতনায় সমৃদ্ধ। সহজ ও সরল ভাষা দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন সাধারণ মানুষের দুঃখ, অনাচার ও প্রবঞ্চনার কথা।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

গণসঙ্গীতের জগতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস একটি স্মরণীয় নাম। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের শ্রীহট্টের মিরাশী গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম হয়। হবিগঞ্জের হাইস্কুলে তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়। ১৯২৭-২৮এ আসামে ডিব্রুগড়ে তাঁর স্কুলের সহপাঠী লোহিত কাকতির কাছে তিনি প্রথম বিহু গান শোনেন ও আসামী লোকগীতির উপর আকৃষ্ট হন। ১৯৩০-৩১এ সিলেটে মুরারী কলেজে তিনি উচ্চ শিক্ষা করেন। ছেলেবেলা থেকে মাতার অনুপ্রেরণায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৫ থেকে গান তিনি লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৫ এ কারারুদ্ধ হন হেমাঙ্গ বাবু। কারাগারেই তাঁর যক্ষ্মা রোগ হয়। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে গণসঙ্গীতগুলি লিখতে শুরু করেন তার মধ্যে কিষাণ-মজুরের কথা প্রবেশ করেছে। ঐ গানগুলিতে নজরুলী ছাপ সুস্পষ্ট ছিল যেমন, "আগে চল আগে চল মজুর কিষান।" ১৯৪২ এর আগষ্টের প্রথম দিকেই তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে আসেন। ১৯৪২ এ বাড়ী থেকে চলে এসে পঞ্চখণ্ডে তাঁর মাসীর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি মাঝিদের কণ্ঠে যে সারি গানটি শুনেছিলেন তার অনুকরণে তাঁর বিখ্যাত গণসঙ্গীত "কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাইরে" গানটি রচনা করলেন। ১৯৪৩ এ I. P. T. A প্রতিষ্ঠা করে সিলেট কালচারাল স্কোয়াড গড়ে তোলেন।

নিবারণ পণ্ডিতের জীবনী

১৯১২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম। তিনি মৈমনসিংহ (আধুনা বাংলাদেশ) জেলার কিশোর গঞ্জের সগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিবারণ পণ্ডিতের পিতার নাম ভগবানচন্দ্র পণ্ডিত। দশ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। তাঁদের সংসার চলত চাষবাসের উপর। পরপর ক'বছর অজন্মা হবার জন্য নিবারণের সংসার অচল প্রায়। তখন তিনি বিড়ি বেঁধে জীবিকা নির্বাহ করেন। নিবারণ বাবু কিশোর গঞ্জের রামানন্দ স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ছেলে বেলা থেকেই তিনি গান ও কবিতা লিখতেন। কিশোর বয়সেই তিনি গান রচনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। নিবারণ বাবু প্রথম দিকে ভক্তিমূলক ও প্রেমের গান কিছু লিখেছিলেন। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে এবং সামাজিক নীতির কশাঘাতে তাঁর লেখনীর মোড় ঘুরে যায়। তখন থেকে তিনি নির্যাতিত ও অত্যাচারিত শ্রমজীবী মানুষের গান লিখতে শুরু করেন।

তিনি এক সময়ে কৃষক আন্দোলন তথা কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্থানে থাকাকালীন আনসার বাহিনী কতৃক তিনি ধৃত হয়ে পাকিস্থান সরকারের পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করেন। তাঁর রচিত 'বাস্তু হারার মরণ কান্না' ও 'খাদ্যের বদলে গুলি' গ্রাম-গঞ্জের মানুষের মনে আলোড়ন তুলেছিল।

বাংলা গান প্রচার ও প্রসারে

আকাশবাণী ও গ্রামোফোন রেকর্ডের অবদান

বাংলা গান প্রচার ও প্রসারে আকাশবাণী ও রেকর্ড কোম্পানীগুলির দান অনস্বীকার্য।

আকাশবাণী দীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরে বাংলা গান-নাটক ইত্যাদির প্রচার ও প্রসারের কাজে লিপ্ত আছে। বহু পুরানো বাংলা গান, লোকগীতি, কীর্তন ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে আজও সংরক্ষিত আছে। আকাশবাণীর Tape Library তে রেডিও-র বাংলা গানের সংরক্ষণশালা এবং সংরক্ষিত পুরানো গ্রামাফোন রেকর্ডস থেকে বাংলা গানের বিবর্তনের ধারাটি অনুধাবন করা যায়।

দীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরে বিভিন্ন ধরনের বাংলাগানের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আকাশবাণী বাংলা গানের ধারাবাহিক রূপটি প্রচার করে চলেছে। কীর্তন, লোক সঙ্গীত থেকে সুরু করে রাগপ্রধান, স্বদেশীগান, প্রাচীন বাংলা গান, শ্যামা সঙ্গীত, রবীন্দ্র-রজনীকান্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও নজরুলগীতির নানা অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলা সংস্কৃতির প্রসারের গুরুদায়িত্ব বহন করে চলেছে আকাশবাণী। অনুষ্ঠানগুলির সুদক্ষ পরিচালক ও প্রযোজকবৃন্দ এই গুরুভার বহন করার জন্য প্রশংসার দাবী রাখেন। তাঁরা যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার নিযুক্ত করে উক্ত অনুষ্ঠান গুলি প্রচার করে শ্রোতাদের চাহিদা মিটিয়েছেন।

প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য যে আকাশ-বাণীর উক্ত অনুষ্ঠানগুলির পরিচালক ও প্রযোজকবৃন্দ সবাই শিল্পী ও প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাই অনুষ্ঠানগুলি এত সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

এরপর গ্রামোফোন কোম্পানীগুলির কথায় আসা যাক। হিজ মাস্টারস্ ভয়েস, হিন্দুস্থান মেগাফোন, সেনোলা, ভারত, পাইওনিয়র ইত্যাদি প্রত্যেকটি কোম্পানী ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তারা কমার্শিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন প্রতিভাকে সুযোগ দিয়ে সেইসব শিল্পী-সুরকার ও গীতিকারদের প্রতিষ্ঠা করেছে।

যুগে যুগে শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের গান রেকর্ড করেছে। বাজারী মনোভাব নিযে রেকর্ড করলেও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট হতে দেয় নাই। হিসমাস্টারস্ ভয়েসই সবচেয়ে বড় পুরানো রেকর্ড কোম্পানী। বিগত কয়েক যুগ ধরে বাংলা গানের প্রচার ও প্রসারের কাজে এই কোম্পানী নিযুক্ত আছে। বাংলার প্রথিতযশা প্রায় সব শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারেরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁদের শিল্পকীর্তি রেখে চলেছেন কয়েক যুগ ধরে। এই কোম্পানীর সুযোগ্য রেকর্ডিং ম্যানেজার ও অ্যাডভাইসর এক এক ধীরেন দাস, এ.সি.

সেন, পি, কে. সেন, ক্ষিতীশ বসু, পবিত্র মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও বর্তমান রেকর্ডিং অ্যাডভাইসর শ্রীবিমান ঘোষের (আকাশবাণীর প্রাক্তন সহ-অধিকর্তা) সুদক্ষ প্রযোজনায় বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলা গানের বিচিত্র ধারা গ্রামোফোন রেকর্ডে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

॥ জীবনী ॥

এণ্টণী ফিরিঙ্গি

এণ্টনী ফিরিঙ্গি জাতিতে পর্তুগীজ ছিলেন তাই তাঁকে এণ্টনী ফিরিঙ্গি বলা হত। মির্জাপুর স্ট্রীটের কাছে এণ্টনী বাগান লেন এণ্টনী সাহেবের নামে তৈরী হয়েছে। ইংরেজ রাজত্বের বহু আগে এণ্টনী কবিয়ালের পিতা সাবর্ণ চৌধুরীর জমিদারবাড়ীতে কর্মচারী ছিলেন। ঐ এণ্টনী সাহেবের কনিষ্ঠপুত্র ছিলেন এণ্টনী কবিয়াল। তিনি ফরাসডাঙ্গা নিবাসী এক ব্রাহ্মণকন্যার প্রেমে পড়েন এবং এক বাগান বাড়ীতে তার সঙ্গে বসবাস করতেন। ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে থেকে তিনি হিন্দুদের বেশভূষা ও খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সময় থেকে তিনি ধুতিচাদর পরা শুরু করেন। নিজের বাড়ীতেই তিনি যাত্রাগানের আসর বসাতে শুরু করেন তাঁর সামান্য অর্থের সাহায্যে। ঐ সময় থেকেই তিনি বাংলাভাষা শিক্ষা করেন সেই ব্রাহ্মণকন্যার কাছ থেকে। তারপর তিনি একটি কবিগানের দল গঠন করেন, সেই থেকেই তিনি এণ্টনী কবিয়াল বলেই পরিচিত হন।

এণ্টনী কবিয়ালের রচিত গান খুবই রুচিশীল ও কাব্যিক ছিল। এই খ্যাতনামা কবিয়াল লোকান্তরিত হন বাংলা ১২৪০ সনে।

লালন ফকির

লালন ফকির বাংলার বাউলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ থাকলেও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এক কায়স্থ পরিবারে লালনের জন্ম হয়েছিল এ কথা অনেকেই মেনে নিয়েছেন। তাঁর জন্ম কুষ্ঠিয়া জেলার অন্তর্গত ভাঁড়রা ও ছেঁউড়িয়ার সন্নিকটে ধর্মপাড়া গ্রামে। লালন ১১৬ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যতদূর জানা যায় লালন নিঃসন্তান ছিলেন। কুষ্ঠিয়ার কিছুদূরে ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালনের আখড়া ছিল। সেখানে পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) চট্টগ্রাম রংপুর, যশোর প্রভৃতি বহুস্থান থেকে শিষ্যরা এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করত। শিষ্যদের মধ্যে শীতল ও ভোলাইকে লালন নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন। নিরক্ষর এই বাউল সম্রাট কি করে উচ্চ দার্শনিকতত্ত্ব সম্বলিত গানগুলি রচনা করেছেন একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ত্ব তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি তাঁর শিষ্যদের সহযোগিতায় বাংলার বাউলদের নিয়ে একটি মহোৎসবের আয়োজন করতেন। বাউল ছাড়াও বহুলোক সে উৎসবে যোগদান করত। লালনের প্রায় তিন শত গান আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লালনের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। লালনের কোন আত্মীয় জীবিত আছেন কিনা জানা যায় নি। চিরকালই লালন অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে চলতেন। তাই তিনি তার নিজের রচনায় বলেছেন —

"সব লোকে কয় লালন কি জাত এ সংসারে
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।"

শোনা যায় তীর্থে যাওয়ার পথে লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সঙ্গীসাথী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এক মুসলমান ফকিরের আশ্রয় লাভ করেন। সেখানেই তিনি জীবন ফিরে পান এবং অবশেষে ফকির হয়ে যান।

শচীনদেব বর্মণ

বাংলা গানের জগতে শচীনদেব বর্মণের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই স্বনামধন্য শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন আগরতলার রাজ পরিবারে। তাই তাঁকে কুমার শচীনদেব বর্মণ বলা হত। বাল্যকাল থেকেই শচীনদেবের সঙ্গীত সাধনা শুরু হয়। রাজ পরিবারের সন্তান হওয়ায় তিনি ভারতীয় সঙ্গীত চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর সম্যকজ্ঞান লাভ করে বিভিন্ন ওস্তাদের গায়কী আত্মস্থ করে নিজের এক বিশেষ গায়কীর সৃষ্টি করেন। তাঁর কণ্ঠে যে বিশেষ ঢঙটি ছিল এবং কণ্ঠস্বরে যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা সচরাচর শিল্পীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের সম্যক্জ্ঞান লাভ করেও তাঁর মন সুদূর গ্রামাঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি বহু লোকগীতি সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রামাফোন রেকর্ডে সেগুলিকে ধরে রেখেছেন তাঁর কণ্ঠের মাধুর্যে। আজো সে গানগুলি প্রতিটি বাঙালীর মুখে মুখে ফেরে।

রাগসঙ্গীতের অনুশীলন সাধারণতঃ শিল্পীর কণ্ঠস্বরকে পরিশীলিত করে তোলে। যার ফলে প্রকৃত লোক সঙ্গীত সেই শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয়না। কারণ লোক সঙ্গীতের গ্রাম্যরূপটি পরিশীলিত কণ্ঠে কোনদিনই পরিস্ফুটিত হয়নি। কিন্তু শচীনদেব বর্মণের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি যেকটি লোকসঙ্গীত গেয়েছেন তাতে পুরোপুরি গ্রাম্যরূপ বজায় ছিল এবং সেইগুলি লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারে এক একটি রত্ন হয়ে আছে। আবার অন্যদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ হয়ে তিনি যে কয়টি বাংলা রাগপ্রধান গান গেয়েছেন সে কটিও বাংলাগানের আকাশে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশেষ।

শচীনদেব বর্মণ শুধু গায়কই ছিলেন না। তিনি ভারতখ্যাত একজন সংগীত পরিচালক ছিলেন রেকর্ড ও চলচিত্র জগতে। শচীনদেব বর্মণের কণ্ঠে, পরিবেশিত গানগুলির মধ্যে রাগাশ্রিত নজরুলগীতিগুলি বিভিন্ন প্রাচীন লোকগীতি বা নজরুলের লোকসংগীত প্রভাবিত গানগুলি অন্যতম। এছাড়া তাঁর রাগপ্রধান গান তো আছেই। তাঁর গানের রচয়িতা ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য্য, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রমুখ বাংলার খ্যাতনামা গীতিকার। ১৯৫৮ সালে শচীনদেব বর্মণ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমী থেকে পুরস্কৃত হন।

আব্বাস্ উদ্দীন আহম্মদ

আব্বাস্উদ্দীন ছিলেন একজন খ্যাতনামা লোকসঙ্গীত শিল্পী। তাঁর জন্ম ২৭শে অক্টোবর, ১৯০১ সালে কুচবিহারের বলরামপুরে। উত্তরবাংলার আঞ্চলিক গীতি ভাওয়াইয়া, চটকায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অপূর্ব খোলা আওয়াজ ছিল তাঁর কণ্ঠের। তিনি অসংখ্য ভাটিয়ালী, জারি, সারি, মুর্শিদা, দেহতত্ব, বিচ্ছেদী মারফতী গান গ্রামাফোন রেকর্ডের মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। সবকটি গান খুবই জনপ্রিয়।

লেখাপড়ায় আব্বাস্উদ্দীন মেধাবী ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গীত সাধনা শুরু হয়। এই শিল্পীর সাধনায় কুচবিহারের লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়ার দান অনস্বীকার্য। রেকর্ডে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কবি শৈলেন্দ্র রায়, নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর দান অপরিসীম।

ফিকির চাঁদ

বাংলা ১২৪০ সালে শ্রাবণ মাসে নদীয়া জেলায় কুমারখালি গ্রামে হরিনাথ মজুমদার (ফিকির চাঁদ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জলধর মজুমদার। হরিনাথ মজুমদার শিশু বয়সেই তাঁর মাতাকে হারান। তারপর থেকে তিনি তাঁর খুল্লোপিতামহীর নিকট মানুষ হন। সংসার সম্পর্কে তাঁর পিতা উদাসীন থাকায় তাঁদের বিষয় সম্পত্তি একে একে প্রায় সবই নষ্ট হয়ে যায়। কিছুদিন পর

হরিনাথের পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতৃমাতৃহীন হয়ে হরিনাথ বাস্তব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে থাকেন। বালক হরিনাথের মানুষ হবার অদম্য সংকল্প। তাই তিনি কৃষ্ণধর মজুমদারের ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। লেখাপড়ার খরচ বহন করেন তাঁর খুল্লতাত নীলা মজুমদার। কিন্তু তাঁর খুল্লতাতের চাকরী চলে যাওয়ায় তাঁর পড়াশুনায় বাধা পড়ে। স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের দয়ায় বিনা বেতনে তিনি তাঁর লেখাপড়া চালাতে থাকেন। কিন্তু খাওয়া পরায় আর্থিক সংকট দেখা দিল। তিনি নিজে অভাবে অনটনে জীবন ছেলেবেলা থেকে অতিবাহিত করায় দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সরকার সেই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার গ্রহণ করায় হরিনাথের শিক্ষকতার জন্য তাঁর মাইনে ধার্য্য হল কুড়ি টাকা। হরিনাথ গ্রামের জমিদারদের অত্যাচার ও অপমানের বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন এবং 'গ্রামবার্তা' পত্রিকা প্রকাশ করে সেই সব প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। 'গ্রামবার্তা' পত্রিকাটিকে তিনি গরীব দুঃখীদের মুখপত্র হিসাবে গড়ে তোলেন।

হরিনাথ নাটক, গান, পাঁচালী রচনা করে বাংলার সঙ্গীত সাহিত্যের ভাণ্ডারে নতুন সংযোজন করেন। তাঁর যে আটখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে "ভাবোচ্ছাস", 'বিজয় বসন্ত', 'কাঙাল ফিকির চাঁদের গীতাবলী' অন্যতম।

ফিকির চাঁদ ছিলেন ধার্মিক। তাই তিনি বহু ভক্তিমূলক গান ও বাউল গান রচনা করেছিলেন। তিনি কুমারখালিতে একটি বাউল দল গঠন করেছিলেন। ঐ বাউলদলের প্রতিষ্ঠাতা বলেই তাঁর নাম হয়েছিল কাঙাল হরিনাথ। কাঙাল হরিনাথের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গানের মধ্যে "হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে"।

অন্যান্য বাউলদের মতো হরিনাথ গানের মধ্যে দিয়ে অরূপরতনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি গেয়েছেন—

> 'অরূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে প্রাণ আমার দিবানিশি,
> সে যে কি অতুল্যরূপ, নয় অনুরূপ শতশত সূর্য্যশশি।'

বাস্তবিকই ফিকির চাঁদের (কাঙাল হরিনাথের) গানগুলি ভাবপ্রধান এবং ভক্তি-রসের ভাবধারায় আপ্লুত। তাঁর গানগুলি কাব্যসুষমায় মণ্ডিত সন্দেহ নাই।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও রাগপ্রধান বাংলা গানের জগতে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সুরের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ছিল ভীষ্মদেবের ছেলেবেলা থেকেই। রেকর্ড থেকে হুবহু গান তোলায়

ক্ষমতা ছিল ছেলেবেলা থেকে। ভীষ্মদেবের যখন সাত বছর বয়স তখনই তাঁর বাবা নগেন দত্ত মশাইয়ের হাতে তাঁকে তুলে দেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্য। ১২ বৎসর বয়সে তিনি ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে তালিম নেওয়া শুরু করেন। এরপর তিনি তাঁর প্রথম বাংলা গানের রেকর্ড দু'খানি নিধুবাবুর টপ্পা দিয়ে তাঁর সংগীত জীবন শুরু করেন। গান দু'খানি এইচ. এম. ভি কোম্পানীতে হয়েছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম ভীষ্মবাবুকে নিয়ে এলেন মেগাফোন কোম্পানীতে। সেখান থেকেই তাঁর বাকী ১২ খানা রেকর্ড বের হয় পরবর্তীকালে। ভীষ্মবাবুর বাংলা রাগপ্রধান গান, 'তব লাগি ব্যথা', 'নবারুণ রাগে', 'শেষের গানখানি তোমার লাগি', 'জাগো আলোক লগনে' ইত্যাদি সত্যই বাংলা গানের জগতে ঐতিহাসিক নিদর্শন। রাগপ্রধান বাংলা গানে তাঁর অবদান অপরিসীম।

চিন্ময় লাহিড়ী

চিন্ময় লাহিড়ীর বাংলা গানে খুব একটা অবদান নাই, একথা বলা চলে না। যদিও চিন্ময়বাবু শাস্ত্রীয় সংগীতেরই শিল্পী, তবু তিনি রেকর্ড ও ছায়াছবিতে যে দু'চারখানি রাগাশ্রিত বাংলা গান সরগম সহযোগে গেয়েছেন তার তুলনা নেই।

চিন্ময়বাবুর সংগীতের হাতে খড়ি হয় তাঁর এক বন্ধুর দাদার কাছে। পরে তিনি তালিম নেন বিখ্যাত ওস্তাদ দিলীপ বেদী, খুরশেদ আলী, ছোটে খাঁ ও পণ্ডিত রতন ঝংকারের কাছে। এছাড়াও চিন্ময়বাবু লক্ষ্মৌ মরিস কলেজে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। লক্ষ্মৌ রেডিওর উদ্বোধনী দিবসে তিনি বেতারে গেয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৪৩—৪৪ সালে তাঁর প্রথম রেকর্ড বের হয় এইচ. এম. ভি. কোম্পানী থেকে।

চিন্ময় লাহিড়ী চল্লিশ দশকের শেষ দিকে অল বেঙ্গল কনফারেন্সে সংগীত পরিবেশন করে সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ঢাকা বেতারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। পরে কলকাতার বেতারে নিয়মিত শিল্পী হয়ে শাস্ত্রীয় সংগীত ও অন্যান্য রাগপ্রধান গান পরিবেশন করে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

'মানদণ্ড', 'শাপমোচন', 'দ্বৈরথ' ইত্যাদি ছবিতে যে রাগপ্রধান গানগুলি গেয়েছেন তা চিরকালই বাংলা গানের, বিশেষ করে বাংলা ছায়াছবির, অমূল্য সম্পদ হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

প্রতিমা ব্যানার্জীর সঙ্গে চিন্ময়বাবুর দ্বৈতকণ্ঠে গীত 'ত্রিবেণী তীর্থ পথে' গানটি সবযুগের শ্রোতাদের কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে। চিন্ময়বাবু দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ করে গত তিন বৎসর পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন।

তারাপদ চক্রবর্তী

তারাপদ চক্রবর্তীর নাম ১৯ শতকের বাংলার সঙ্গীত জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর ঘরানা বলতে নিজেই একটী ঘরানা অর্থাৎ তিনি ধারাবাহিকভাবে কোন ঘরানাকেই অনুসরণ করেন নাই। তাঁর নিজস্ব গায়নভঙ্গী, বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব নূতন ভঙ্গী বা style-এর সৃষ্টি করেছে। তারাপদবাবুর নিজস্ব কোনও সঙ্গীত গুরু ছিলেন না।

আজকের বাংলাদেশে ফরিদপুরস্থিত কোটালী পাড়া গ্রামে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল একটি সাংগীতিক পরিবারে তারাপদবাবুর জন্ম হয়। তাঁর পিতা কুলচন্দ্র চক্রবর্তী এবং কাকা রামচন্দ্র চক্রবর্তী দুজনেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। এবং এঁদের হাতেই তারাপদবাবুর সঙ্গীত-শিক্ষা। তারপর সাতকড়ি মালাকার, গিরিজা শংকর চক্রবর্তী, ওস্তাদ মৈজুদ্দিন, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সংগীত শিক্ষা করেছেন। কিন্তু সাধারণ সংগীত শিল্পীদের মত তারাপদবাবু তাঁর গুরুদের হুবহু নকল করেন নি। তাঁর প্রতিভাবলে এক নিজস্ব গায়কী তিনি গড়ে তোলেন এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তারাপদবাবু অনেকের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সংগীতশৈলী-গ্রহণ করেছেন এবং তা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছেন। তারপর তিনি সৃষ্টি করেছেন নতুন গায়কী বা শৈলী। এইটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং এইটিই তাঁর নিজস্ব ঘরানা। তারাপদবাবুর গান ভাবপ্রধান। গানের গায়কী ও শৈলীতে গোয়ালিয়র ঘরানার ছাপ সুস্পষ্ট, তানে রয়েছে বৈচিত্র্যের মাধুর্য্য, গমকের কাজে তাঁর সংগে কারও তুলনা করা চলে না। যেহেতু তিনি ভাবপ্রধান গায়ক এবং তাঁর নিজস্ব ঢং ছিল সেইজন্য তাঁর গান শ্রোতাদের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে। তারাপদবাবু প্রথম জীবনে তবলাবাদক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর তবলাবাদক হিসাবে তিনি স্বীকৃতিও পেয়েছেন, তবে হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রাসাদে দশদিন ব্যাপী সংগীত সম্মেলনে বিভিন্ন ভারত বিখ্যাত ওস্তাদদের সংগে সংগীত পরিবেশন করে সারা ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

তারাপদ চক্রবর্তী আর্থিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। স্মরণশক্তি ছিল তার প্রখর। যেকোনো ওস্তাদের গান শুনলেই তাঁকে হুবহু অনুকরণ করতে পারতেন। তবে তিনি ছিলেন অভিমানী, জেদী সঙ্গীত শিল্পী। বেতারে গ্রেডেসনের জন্য অডিসন দিতে অস্বীকার করায় আকাশবাণীর সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বাংলা খেয়াল ও ঠুংরি গানের প্রচারে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তিনি নিজে গান গেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে বাংলাভাষায় খেয়াল ও ঠুংরি গাওয়া সম্ভব।

সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী

সুধীরলাল চক্রবর্ত্তীর নাম বাংলা সঙ্গীতের বিশেষ করে আধুনিক গানের জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা আধুনিক গানের গতানুগতিক রূপকে পাল্টিয়ে রাগসংগীতের কাঠামোয় আবেগধর্মী করে তোলেন এই প্রতিভাবান সুরকার ও শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী।

সুধীরলালের জন্ম ফরিদপুরে (অধুনা বাংলাদেশ)। তাঁর পিতা ৺গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী ফরিদপুরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত। তাই সুধীরলাল বাল্যকাল থেকেই সংগীতের পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন এবং সেখান থেকেই সংগীত সাধনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সুধীরলাল ছিলেন সত্যিকারের মেধাবী শ্রুতিধর—যে গানই তিনি একবার শুনতেন তাই অতি সহজে আয়ত্ব করে নিতে পারতেন। তাঁর এই গুণের জন্য বাংলার বিখ্যাত সংগীত গুরু ৺গিরিজাশংকর চক্রবর্ত্তী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিয়মিত তালিম দিতে শুরু করেন। এরপরে অবশ্য সুধীরলাল ভারতবিখ্যাত বহু সংগীতজ্ঞদের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন সুধীরলাল।

এরপর তিনি সুর সৃষ্টির নেশায় মেতে ওঠেন। ভারতীয় সংগীতের কাঠামোয় বাংলা আধুনিক গান রচনা করতে সুরু করলেন। খুবই আবেগময় হয়ে উঠল সেই গান। বাংলা আধুনিক গান নতুন মোড় নিল।

সুধীরলালের প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড হীরেন বসু মহাশয়ের কথা ও সুরে। সুধীরলাল. গীত গজল ও ঠুংরিতেও পারদর্শী ছিলেন, তাই তাঁর বাংলা গানের সুরসৃষ্টিতেও গজল ও ঠুংরীর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তাঁর সুরে স্বতন্ত্র এক রূপ আছে। সুধীরলালের কণ্ঠে তাঁরিই সুরারোপিত "খেলা ঘর মোর", "ও তোর জীবন বীণা আপনি বাজে", 'মধুর আমার মায়ের হাঁসি' গানগুলি বাংলা আধুনিক গানের ভাণ্ডারের এক একটি রত্ন। সুধীরলালের সঙ্গীত পরিচালনায় বহু খ্যাতনামা শিল্পী গ্রামোফোন রেকর্ড করেছেন। তবে তাঁর প্রিয় শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে শ্যামল মিত্র ও উৎপলা সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। অতি অল্প বয়সে এই নবীন প্রতিভার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

পঙ্কজ কুমার মল্লিক

দক্ষিণ কলকাতার গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে পংকজ কুমার মল্লিকের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৺মণিমোহন মল্লিক সঙ্গীত রসিক ছিলেন। বছরে একবার করে তিনি নিজের বাড়ীতে গানের জলশা বসাতেন—সেই থেকেই পংকজবাবুর সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা জাগে। তখনকার প্রখ্যাত গায়কের কাছে পংকজবাবুর প্রথম সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। অপূর্ব বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন পংকজবাবু। কণ্ঠের জন্য তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথের সুনজরে পড়েন। তিনি ১৯২৭ সালের গোড়াতেই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুরাগী পংকজ মল্লিক বাংলা সংগীতের জগতে সুরকাররূপে আবির্ভূত হন। তিনিই প্রথম চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীত আনেন। ১৯২৮-২৯ সালে তিনি নিউ থিয়েটার্স কোম্পানীতে চলে আসেন। নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবিতে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেন এবং নেপথ্যে কণ্ঠ দান করেন। তখনকার দিনে সেই ছবিগুলির গান প্রায় সব কয়টিই হিট্। বহু বৎসর ধরে পংকজবাবু আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বভার বহন করেন। রাবীন্দ্রিক প্রভাব থাকলেও তাঁর সুর রচনায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, কীর্তন ও লোকসংগীতের আমেজ পুরোপুরি ছিল—সুরের মিশ্রণেও তাঁর মুনসীয়ানার পরিচয় ছিল।

পংকজ মল্লিকের সুরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বাণীকুমার রচিত ও বীরেন ভদ্র কর্তৃক চণ্ডীপাঠ "মহিষাসুর মর্দ্দিনী" বিশেষ গীতি আলেখ্য। বাংলা সংগীতের ইতিহাসে উক্ত অনুষ্ঠানটি বিংশশতকের আর এক নতুন সংযোজন।

গীতিকার শৈলেন রায়

১৯০৫ সালে কুচবিহার শহরে শৈলেন রায়ের জন্ম। ১২ বৎসর বয়স থেকেই শৈলেনবাবু কবিতা লিখতেন। নজরুল ইস্‌লাম কুচবিহারে গিয়ে শৈলেন রায়কে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং তখন থেকেই তিনি গান রচনা শুরু করেন। ১৯২৭ সালে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের কণ্ঠে শলৈনবাবুর প্রথম লেখা গান রেকর্ড হয়। এ ছাড়াও আরোও কিছু গানের জন্য তিনি গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে অর্থ পান। সে যুগের আধুনিক বাংলা গানের জগতে শৈলেন রায়ের দান অনস্বীকার্য্য। তখনকার জনপ্রিয় প্রায় সব শিল্পীর কণ্ঠেই তাঁর লেখা গানের রেকর্ড হয়েছে। ক্রমে ক্রমে শৈলেনবাবুর নাম যশ ছড়িয়ে পড়ল। কাজী নজরুল ও শৈলেনবাবুর প্রচেষ্টায় রেকর্ড কোম্পানীতে গীতিকারদের রয়্যালটি দেওয়ার প্রথা চালু হল।

তাঁর অজস্র গানের মধ্যে শচীনদেব বর্মণের কণ্ঠে "প্রেমের সমাধি তীরে" এবং

চলচ্চিত্রের গান "রাখে ভুল করে তুই চিনলি না তোর", "তোমার বাঁধন খুলতে লাগে", 'গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই' ইত্যাদি গানগুলি আজও মনে দোলা দেয়।

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

আধুনিক সংগীতের জগতে ও চলচ্চিত্রে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের নাম চিরস্মরণীয়। অপূর্ব আবেগ ও কাব্যমাধুর্য গৌরীবাবুর সঙ্গীত রচনায়। ছন্দের বৈচিত্র্য, উপমা কিছুটা রাবীন্দ্রিক ঘেঁসা হলেও স্বাতন্ত্র্য দাবী রাখে। বার বছর বয়সেই গৌরীবাবু কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন গৌরীবাবু। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখল ছিল তাঁর। ছাত্রাবস্থায় বন্ধু নচিকেতা ঘোষের অনুপ্রেরণায় গৌরীপ্রসন্ন গান লিখে চললেন। তারপর তিনি এলেন রেকর্ড ও ফিল্মের জগতে গীতিকার হিসেবে। তাঁর লেখা ৪ খানা গানের প্রথম রেকর্ড বিমলভূষণের কণ্ঠে। তারপর একে একে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, হৈমন্তী শুক্লা, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সতীনাথ, উৎপলা, শচীনদেব বর্মণ, আশা ভোঁসলে, কিশোর কুমার, লতা মুঙ্গেশকার ইত্যাদি সব প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের গাওয়া বহু রেকর্ড আত্মপ্রকাশ করে, তাঁর খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যে আধুনিক বাংলা গানের জগত ও চলচ্চিত্র জগতে ছড়িয়ে পড়ে। গানগুলির প্রায় সব কয়টি সে যুগের সুপার হিট্। এখনও একালে তাঁর ঐ পুরুনো গানগুলি নতুন ভাবে Re-print হয়ে একালের শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৯৮৭ সনে কিছুদিন আগে এই প্রতিভাবান গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

১৯২১ সালে জন্ম। ছেলেবেলায় লেখালেখির প্রতি ঝোঁক ছিল হেমন্তবাবুর। দেশ পত্রিকায় কিছু গল্পও ছাপা হয়েছিল। গানের টানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সঙ্গে সাহিত্য চর্চাও ত্যাগ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯৩৫ সালে রেডিওতে প্রথম গান করেন। ১৯৩৭ সালে কলম্বিয়ায় প্রথম গানের রেকর্ড করেন। ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ২ বছর ক্লাসিকাল গানের তালিম নেন। রেওয়াজ টেওয়াজ যা কিছু এই সময়ই যা করেছিলেন। পরে আর কোনদিনই তেমন করেন নি। প্রথম জীবনে পঙ্কজ মল্লিক, সাইগল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীনদেব এঁদের স্টাইলে গান গাইতেন। বিশেষ করে পঙ্কজ মল্লিককে এত অনুকরণ করতেন যে নামই হয়ে গিয়েছিল ছোট পঙ্কজ। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গান পঙ্কজ মল্লিকের কাছে শিখেছেন। বেশীরভাগ শিখেছেন স্বরলিপি অনুসরণ করে নিজে নিজে। তিনি অকপটে স্বীকার করেন সঙ্গীত

পরিচালনার ক্ষেত্রে-রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের/গীতিনাট্যের স্বরলিপি থেকে টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো যেমন, ছন্দ, সুর, কথার ইমোশন, কথার ভাব, ড্রামাটিক সিচুয়েশন, তালের ডিভিসন এসব অনেককিছু শিখেছেন।

বাংলা গানের ধারাবাহিকতায় দশম শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কিছু গানের সংকলন

চর্যাপদ (চর্যাগান)—লুইপাদ **রাগ পটমঞ্জরী**

(খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী)

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥
দিঢ় করি-অ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছি অ জান॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস॥
ভণই লুই আমহে ঝানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

জয়দেবের পদাবলী (গীতগোবিন্দ) [মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে]
(১১১৯—১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্॥
কেশব, ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ধরণি ধরণ কিণচক্র গরিষ্ঠে॥

কেশব, ধৃতকূর্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না ।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ॥
কেশব, ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
তব কর—কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং ।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ॥
কেশব, ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন ।
পদনখনীরজনিতজনপাবন ॥
কেশব, ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং ।
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্ ॥
কেশব, ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিকপতিকমনীয়ং ।
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব, ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ॥
কেশব, ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং ।
সদয় হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং ।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ॥
কেশব, ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ।
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং ।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥
কেশব, ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলি ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
(আনুমানিক ১২১০ থেকে ১২৫০ খৃষ্টাব্দ)

রামগিরীরাগঃ ॥
॥ রূপকং ॥

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে
কুসুম সমূহে শোভে সব তরুগণে ॥
তাত সুললিত ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল ॥ ১ ॥
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হন যৌবনে ॥ ধ্রু ॥
শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার অন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
এক ঠাঁয়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পহু ফল খাঅ ত্রিভুবনের সার ॥ ২ ॥
এহা বন আদভূত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জানে ॥
তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী ॥
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী ॥ ৩ ॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার ॥
এহাত উচিৎ হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ (বৃন্দাবন খণ্ড)

প্রাচীন যাত্রাগান (স্বপ্নবিলাস)
(আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম)

শোন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ দেখা দিয়ে
গোপাল কোথায় লুকালে।
যেন, সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরে কাঁদে,
"জননী, দে ননী দে ননী" ব'লে ॥
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর
বিধুমুখে যেন কত মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে "মা" ব'লে।

কত কাঁদে বাছা বলি, "সর সর"
আমি অভাগিনী বলি "সর সর"
নাহি অবসর, কেবা দিবে সর
"সর! সর!" বলি ফেলিলাম ঠেলে।

ধূলা ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাঁদ
অঞ্চলে মুছালেম চাঁদের বদন চাঁদ
পুনঃ চাঁদ কাঁদে চাঁদ চাঁদ, ব'লে।

যে চাঁদ নিছনি কোটি কোটি চাঁদ
সে কেন কাঁদিবে বলি "চাঁদ চাঁদ"
বললেম, "চাঁদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাঁদ
ঐ দেখ্ চাঁদ আছেরে চরণ-তলে"।

গোপাল উড়ের যাত্রাগান (বিদ্যাসুন্দর যাত্রা)

(আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি)

রাগ—ভৈরবী
তাল : আড়্খেমটা

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার
চাদ্দিকে (চারদিকে) মালঞ্চের বেড়া,
ভ্রমরাতে গুণ্ গুণ্ করে,
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥

ময়ূর ময়ূরী সনে,
আনন্দিত কুসুম বনে;
আমার এই ফুল বাগানে,
তিলেক নাই বসন্ত-ছাড়া॥

যদি অনুগ্রহ করে এস এ অধিনীর ঘরে,
যত্ন করে রাখি তোরে,
বারেক না করি ছাড়া॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের শাক্ত পদাবলী

(১৮০২ খৃষ্টাব্দ)

রাগ—ইমনকল্যান
তাল—ধামার

বামা কেরে এলো চিকুরে,
বিহরে আনন্দময়ী, শবহৃদি'পরে ;

বসন নাহিক গায় পদ্মগন্ধে অলি ধায়,
চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে, আসব ভরে।

যে ঠেকেছে রাঙা পায়, হত দিতি-সুতচয়,
স্পর্শ-মাত্র শিব হয়,
সময় মাঝারে ;

কমলাকান্তের ভাষী,
সর্বনাশী ধ'রে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের শাক্ত পদাবলী

(১৮১০ খৃষ্টাব্দ)

তাল—একতাল (ত্রিমাত্রিক)

মন-গরীবের কি দোষ আছে, তারে কেন নিন্দা কর মিছে ?
বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥

শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে ॥

আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেমনি সংগ ভাল মিলেছে।
সে লেংটা থাকে, ভস্ম মাখে লোকে ভাল বলে পাছে ॥

তবে যে কমলাকান্ত ও চরণে প্রাণ স'পেছে—
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন সার করেছে ॥

রসিকচন্দ্র রায়ের বিজয়ার গান

(অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ)

তাল—ঝাঁপতাল

দিও না আজ উমায় যেতে, ওগো মা মেনকারাণী।
আশুতোষে আশু তুষে, বিদায় কর গো এখনি।
হাসি হাসি উমা এলো, কেঁদে হলো এলোথেলো,
কেন আজি পোহাইলা নবমী রজনী।
ভেবে চিন্তে উমাশশী, যেন রাহুগ্রস্থ শশী,
হানিল হৃদয়ে আসি কি শূল ত্রিশূলপানি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিজয়ার গান

(উনবিংশ শতাব্দীর শেষ)

তাল—ঝাঁপতাল

কালকে ভোলা এলে বলবো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে।
বলে বলুক যে যা বলে মানবো না আর জামাই ব'লে ;
যায় যাবে সে, গেলে চ'লে—যা হয় তখন দেখবো পরে।
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, র'ব আর পরাণ ধ'রে।
আঁচল ধরে পাছে ছোটে ; ঘুমিয়ে উমা চমকে ওঠে,
শ্বশুর-ঘর কি জানে মোটে, কত বকি তারি তরে॥

হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল ফিকির চাঁদ)-এর বাউল গান

(উনবিংশ শতাব্দীর শেষ)

তাল—তেওড়া

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হ'তে ইচ্ছে যায়, তার শাক্ত হ'তে হয়॥
শক্তি হ'লে প্রকাশ সেই শক্তিতে প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অসম্মান বলিদান দিয়ে কর রিপু জয়॥
রিপু-জয় হ'লে হরজ্ঞানের বৃদ্ধি,
অনায়াসে তখন হবে সিদ্ধি,
নইলে মন অ আ ই ঈ করতে হয়॥

সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণবলক্ষণ,
তখন হিংসা আদি হয় রে বারণ,
বিবেকী যখন হয় রে মন,
তখন ভক্তির উদয় ॥
কাঙাল বলিছে ভক্তি হয় যখন,
ওরে ভেদ জ্ঞান থাকে না তখন,
যায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি,
জগৎ দেখে ব্রহ্মময় ॥

রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীত

(১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)

সুর ঃ প্রসাদী
তাল ঃ একতাল

আমি ঐ খেদে খেদ দরি।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, কিন্তু সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি জেনেছি, আশয় পেয়েছি এসব তোমার চাতুরী ॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥
যশ, অপযশ, সুরস, কুরস, সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছে, মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত

রচনাকাল (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ আনুমাণিক)

সুর—জংলা
তাল—একতাল

আমার অন্তরে আনন্দময়ী
সদা করিতেছেন কেলি ॥
আমি যেভাবে সেভাবে থাকি,
নামটি কভু নাহি ভুলি।

আবার দু' আঁখি মুদিলে দেখি,
অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত,
আবার পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তা বলুক তারা,
অন্তে যেন পাই পাগলী ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে,
অন্তে না ফেলিও ঠেলি।

যদুভট্টের গান

(ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ)

রাগ ঃ দেশ।
তাল ঃ সুরফাকতাল

দেখিয়ে হৃদয়-মন্দিরে, ভজনা শিব সুন্দরে।
কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে কর অযতন, এখন করহ সাধন ॥
এই সে পতিত-পাবন, এই সে জগত তারণ,
এই সে পরম কারণ, করহ তাঁর মনন ॥
হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম সত্ব,
ভাবিলে না সেই সত্য, নিত্য বিভু নিরঞ্জন।
হৃদয়ের প্রেমহার, দাও হে তাঁরে উপহার,
পেয়েছ কৃপায় যাঁহার দেহ হৃদয়-জীবন ॥

নিধুবাবুর টপ্পা

(১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ)

তাল—যৎ (৮ মাত্রা)

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে।
সৌরভে গৌরবে কে তোমারি তুলনা হ'বে,
আপনি,—আপন সম্ভবে যেন গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে।

কাজী মির্জার পুরাতনী বাংলা গান

(১৭৮০ খৃষ্টাব্দ)

তাল—খং (৮ মাত্রা)

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা
দক্ষিণে কালীকে কৃষ্ণ ভেদ ক'রো না।
অসিধারী, বংশীধারী, পিতাম্বর দিগম্বরী,
দ্বিভুজ মুরলীধারী লোলরসনা।
বনমালী মুণ্ডমালা, শিখিপুচ্ছ শশিভালা,
মকরাকৃতি কুণ্ডলা, কভু শব-শিশুবলি,
দেখ এই কৃষ্ণ-কালী, অভেদ মান না॥

গিরিশ ঘোষের নাটকের গান

(চৈতন্য-লীলা নাটক)

(১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ)

রাগ—মিশ্র বিভাস
তাল—ত্রিতাল

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন আসে না।
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখবো এবার মন যদি তার পাই
এবার গৌর হয়ে ধরবো পায়ে
আর তো কাল রবে না।
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগী বেশে ফিরবো দেশে
ঘরে তো মন বসে না॥

দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটকের গান

(১৮৮০ খৃষ্টাব্দ)

রাগ—ছায়ানট মিশ্র
তাল—তেওড়া

হৃদয় আমার গোপন ক'রে আর তো লো সই রইতে নারি,
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে থরথর কাঁপছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে, ঝাঁপিয়ে পড়ে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধরে রইতে পারি ?
মানের মানা শুনব না আর, মান অভিমান আর কি সাজে?
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দেব ঐ তুফান মাঝে।
যাব তার তরঙ্গে চড়ি দেখব গিয়ে কোথায় পড়ি
জীবন যখন করেছি পণ সরমের ধার আর কি ধারি ?

গোবিন্দ দাসের পদাবলী কীর্তন

(মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী)

রাগ—শ্রীরাগ
তাল—খয়রা

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবণী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর, কিখনে দেখিনু, ধৈরজ রহুল দূরে।
নিরবধি মোর চিত্ত বেয়াকুল, কেনবা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাখে, বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায়॥
মালতী ফুলের, মালাটি গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতাল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে॥
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাঁধল, না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি, হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয়॥

বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্তন
(মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী)

রাগ—কীর্তনের সুর
তাল—খয়রা

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় ।
দেহ তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু, দয়া জনু ন ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি, যব তুহুঁ করবি বিচার ।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি, জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশুপাখি কিয়ে জনমিয়ে, অথবা কীট পতঙ্গ ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনপুন, মতিরহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্তন
(মধ্যযুগের পদাবলী)

সুর—কীর্তনের সুর
তাল—লোফা

সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল ।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥
সখি কি মোর কপালে লেখি ।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া চাঁদ সেবিনু, পড়িনু অগাধ জলে ।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম মাণিক পাবার আশে ।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম-দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল ।
কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি মরমে রহিল শেল ॥

দাশরথি রায়ের পাঁচালী গান
(১৮৩২ খৃষ্টাব্দ)
(কলঙ্ক ভঞ্জন পালা)

গোকুলে কপট মূর্ছাগত হন চিন্তামণি।
জানিয়া নারদ যোগী উদ্‌যোগী অমনি॥
অতি হৃষ্টে ঢেঁকিপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
দেখিতে আনন্দে যান নন্দের ভবন॥
অসার ভেবে, সংসার প্রতি কার দ্বেষ।
নিরন্তর নিজ মনকে দেন উপদেশ॥
মন! কর ভাই মনোযোগ, মনের কথা বলি।
সংসারের সুখ-সজ্জা মিথ্যা রে সকলি॥
যেমন স্বপ্নের রাজ্যপদ—মিথ্যা জেনো ভাই।
বালকের ধূলার ঘর—এঘর জেনো তাই॥
ব্যবসাদারের সত্য কথা—মিথ্যা তাকে ধরো।
সতীনে সতীনে পিরীত—মিথ্যা জ্ঞান করো॥
বাজীকরের ভেল্কী যেমন মিথ্যা জানা আছে।
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন, স্ত্রীলোকের কাছে॥
দস্তখত বিনা যেমন, মিথ্যা খত-পাটা।
দুর্ব্বলের দাঁত খামুটি, মিথ্যা জেনো সেটা॥
মৃত্যুকালে সবলা নাড়ী মিথ্যা তাকে ধরি।
চোরের যেমন ভক্তি প্রকাশ, মিথ্যা জ্ঞান করি॥
...... ইত্যাদি।

দাশরথি রায়ের শ্যামা সঙ্গীত
(১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ)

রাগ—সোহিনী (মিশ্র)
তাল—ঝাঁপতাল

যে ভাবে তারাপদ, ঘটে কি তার আপদ।
যে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ প্রদায়িনী॥
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর পদতলে।
ডাকিলে 'জয়কালী' বলে, কাল ভয়ে পালায় অমনি॥

মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত।
কাল-হরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণ-ধারিণী ॥
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন হ'ন করালী।
কখন হ'ন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক গান

(১৯০১—১৯০৫ খৃষ্টাব্দ)

চলরে চল্ সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর দর্পে পৌরুষ গর্বে, সাধরে সাধ সবে দেশের কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ, জাগো সবে বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ ॥
এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ।
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান ॥
দেশ দেশান্তে যাওরে আনতে নব নব জ্ঞান।
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাওরে নবতর তান ॥
লোকরঞ্জন, লোকগঞ্জন না করি দৃক্‌পাত।
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান ॥
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান।
এক পথে, এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক গান

(১৯০২—১৯১০ খৃষ্টাব্দ)

সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী।
শতখনি রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়।

জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়।
হোক ভারতের জয়, কি ভয়, কি ভয়।
গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,
অতুলনা ভারত ললনা।
কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন-ভিন্ন, হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক গান

(১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ)

বাউল—দাদ্‌রা

একবার গালভরা মা ডাকে।
মা ব'লে ডাক্, মা বলে ডাক্, মা বলে ডাক্ মাকে॥

ডাক এমনি করে আকাশভুবন সেই ডাকে যাক ভরে।
আর ভায়ে ভায়ে এক হয়ে যাক্ যেখানে যে থাকে॥

দুটি বাহু তুলে নৃত্য ক'বে ডাক্‌রে মা, মা বলে,
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে।

মায়ের চরণ দু'টি জড়িয়ে ধরে, আনরে মায়ে লুটে,
ছেলের শুনলে সে ডাক্ দেখব সে মা কেমন করে থাকে।

দিয়ে করতালি 'মা', 'মা', বলি ডাকবে এমনি ভাবে,
উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে;
মায়ের বুকের ওপর আছড়ে প'ড়ে চক্ষু দু'টি মুদে।
আমার গান ভেসে যাক্ প্রাণ ভেসে যাক্ দেখি শুধুই মাকে॥

ধ্রুপদ অঙ্গের রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত
(ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক)

রাগ—সাহানা
তাল—ধামার

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় ॥
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে, এ তো ভাল নয় ॥

ধ্রুপদ অঙ্গের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান
(ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক)

সুর—আলাহিয়া
তাল—একতাল

দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান
তুমি মঙ্গল-আলয়,
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ,
দেহ প্রীতি, শ্রদ্ধা প্রীতি
তুমি মঙ্গল-আলয় ॥
তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
দেহ ও-পদে আশ্রয় ॥

রজনীকান্তের ব্রহ্মসঙ্গীত
(১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

রাগ—কালেংড়া
তাল—একতাল

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ যদি, পাই না কেন হে ডাকিয়া।
অন্ধ নয়ন হেরে না তোমারে, কে রেখেছে আঁখি ঢাকিয়া ॥
খুলে দাও আঁখি মায়ার বন্ধন, ঢালিতে ভকতি-কুসুম-চন্দন,
যেন শান্তি-সুধা লভে এ জীবনে, তোমার চরণ পূজিয়া ॥
ডুবে যায় রবি, নাহি আর বেলা, পারি না খেলিতে মিছে ধূলা খেলা,
লভিতে চরণ আকুল এমন, দেখা দাও হৃদে আসিয়া ॥

অতুলপ্রসাদের ব্রহ্মসঙ্গীত

রচনাকাল (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ)

রাগ—ভৈরব

তাল—একতাল

কে হে তুমি সুন্দর, সুন্দর অতি সুন্দর ।
কভু নবীন ভানু-ভালে, ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগ-কূজিত-কুহক-কণ্ঠে গাহিছ অতি সুন্দর !
কভু নির্ম্মল নীল প্রাতে, কনক-কিরীট মাথে,
অভ্রভেদী অচলাসনে রাজিছ অতি সুন্দর !
কভু পুষ্পিত নভ কুঞ্জে তব নৈশ বংশী গুঞ্জে ;
কভু পীত-জোৎস্না-বসন শ্যাম মূরতি অতি সুন্দর !

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত

(১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ)

রাগ—ভৈরবী

তাল—একতাল

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী !
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখে, দাও তাপ সকলি সহিব আমি ।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও না জানি ;
ঐ মঙ্গলময় ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি ॥
আনন্দময় তোমারি বিশ্ব, শোভা-সুখ-পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী ॥
মোহ বন্ধন-ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে ;
অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে থাক দিবস-যামী ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্তিগীতি
(১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ)

রাগ : ভৈরবী চতুর্মাত্রিক

আমার আমার ব'লে ডাকি, আমার এ ও আমার তা,
তোমার নিয়ে তুমি থাকো, নিও নাকো আমার যা।
আমার বাড়ী, আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে,
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে,আমার মেয়ে, আমার বাবা আমার মা,
আমার পতি, আমার পত্নী, সঙ্গে তো কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ—তবে তাও রেখে যেতে হবে,
আমার ব'লে কারে ডাকি ?—চোখ বুজলে কেউ কারো না।

কাজী নজরুলের রচিত শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের গান
(১৯২৮ খৃষ্টাব্দ)

পথ হারা পাখী কেঁদে ফেরে একা,
আমার জীবনে শুধু আঁধারের লেখা।
বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে,
আশ্রয় যাচি হায়, কাহার কাছে,
বুঝি দুখ নিশি মোর,
হবে না হবে না ভোর,
ফুটিবে না আশার আলোক রেখা ॥

আধুনিক গান
(বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি)

রচনা : অজয় ভট্টাচার্য্য
সুর : সুরসাগর হিমাংশু দত্ত

যদি ভুলে যাবে মোরে,
কেন ফুল ডোরে বাঁধা,
বাঁশী যদি ভোলে গান,
তবে কেন সুরে সাধা,

নয়নে নয়ন রাখি,
এই চাওয়া হবে ফাঁকি।
পথ পানে আঁখি মেলি,
রয়েছে ফুলের বাধা ॥

আজি বাতায়নে হেনা,
প্রণয়-মুখর রাতি,
বুঝি নিভিবার আগে—
জ্বলে উৎসব বাতি।

চকোরে চাহিয়া চাঁদ,
কেন রচে মায়া ফাঁদ,
জানা ছিল যদি মনে,
রবে শুধু চির কাঁদা।

আধুনিক গান

(বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি)

রচনা : শৈলেন রায়
সুর : সুরসাগর হিমাংশু দত্ত

বেদনার মাঝে তোমারে খুঁজিয়া পাই,
বিরহ দহনে তাইতো জ্বলিতে চাই ॥
অন্তরে তুমি রবে মোর প্রেম গৌরবে,
মিলনে যা তুমি দিলে নাকো মোরে,
বিরহে দিলে যে তাই ॥

এই দেহ মন জ্বালিয়া একটি সুরে,
ধূপের সুবাসে রহুক তোমারে ঘিরে,
জীবনের বৈকালী, ঝরা ফুলে ভরা ডালি,
ভুলে গেছি হাসি, ভুলে গেছি বাঁশী,
তোমারে তো ভুলি নাই ॥

স্বরলিপি

নিধুবাবুর গান

[১]

(সংকলন ও স্বরলিপি : রাজ্যেশ্বর মিত্র)

দেশমল্লার। তেতালা

কি হল আমারে সই, বল কি করি
নয়ন লাগিল যাহে, কেমনে পাসরি ?
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি ॥

১ ২ ০ ৩ I

II রা গা মা ধপা I মা গরা সনা -সা I রগা রগা মধা ধপা I মা -পমা -রগা -রা I
কি হ ল আ০ মা রে০ স০ ই ব০ ল কি০ ক ক রি ০০ ০ ০

I মা রা মা মা I মপা মপা পমা পা I মা পা মপধা ধপা I মপা -ধপা মা -গরা II
ন য় ন লা গি০ ল যা হে কে ম নে০০ পা স০ ০ ০ রি ০

II না না না নধা I না র্সা না র্সা I নর্সর্রা র্রর্সা পধা পা I মপা -র্রা র্রা -র্সনা I
হে রি লে হ০ রি ষ চি ত না০০ হে রি০ লে ম০ ০ রি ০০

I না না না র্সা I না র্সা না র্সা I ণা ধপা মগা মা I মধা -পর্সণা ধা -পা I
তৃ ষি ত চা ত কী যে ন থা কে০ আ০ শা ক০ ০০০ রি ০

I পা না র্সা নর্সর্রা I র্সা ণা ধা পা I মা পা মপধা পধা I মপা -ধপা মা -গরা II II
ঘ ন মু খ০০ হে রি সু খী দু খী বি০০ নে০ বা০ ০০ রি ০০

গীতরত্ন গ্রন্থে সুর ও তাল : সোহিণী, জলদ তেতালা

নিধুবাবুর গান

[২]

দেশমল্লার। তেতালা

ছাড়িলে তো ছাড়া নাহি যায়
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায়॥
অতএব এই বিধি
যাহা করিয়াছে বিধি
ইহা কি অন্যথা হয় লোকেরি কথায়

১´ ২ ০ ৩ ।
॥ রা গা মা ধপা । মা গরা সা ন্‌া । সা -া -া -া । -া -া -া -া
ছা ড়ি লে তো ছা ড়া০ না হি যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্‌

। মা রা মা মা । পা -া পা পা । পনা -র্সর্রা -না -র্সা । পধা মপধপা মা -গরা ॥
ছা ড়া হে ন র ব্‌ হ লে প্রা০ ০০ ০ ণ্‌ বা০ হি০০০ রা ০য়্‌

[না না না -ধা]
॥ { মা পা না -া । না র্সা না র্সা । ণা ণা ণধা পা । মপা পর্রা র্রা র্রনা } ।
অ ত এ ব্‌ এ ই বি ধি যা হা ক রি য়া০ ছে০ বি ধি০

। না না না না । না র্সা না -র্সা । পা ধা মপধা ধপা । মা -গা -রা -া ॥ ॥
ই হা কি অ ন্য থা হ য়্‌ লো কে রি০০ ক থা ০ ০ য়্‌

গীতরত্ন গ্রন্থে সুর ও তাল : কামোদ খাম্বাজ, জলদ তেতালা

[৩]

খাম্বাজ । তেতালা

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলংকছলে ॥
সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে যেমন গঙ্গাপূজো গঙ্গাজলে

১´ ২ ০ ৩
II গা মা মা -া | -া -া -া -া | গা গা গমা -পমা | -গা -রগা মা পা I
তো মা রি ০ ০ ০ ০ ০ তু ল না০ ০০ ০ ০ তু মি

I পধা -মা -পা -া | মধা -ধপা -মপা মা | গা -মা -রা -া | -া রা -গা রা I
প্রা০ ০ ০ ণ্ এ০ ০ ০০ ম হী০ ০ ০ ০ ম ণ্ ড

I গমা -পধা -ধপা -মগা | -মপা -পমা -গরা -গমা | -মগা -রসা -ন্সা -া |
লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

-া -া -া -া I ধা ণা ধা ধা | -া -া গা মা | পধা -ণর্সা -র্সণা -ধা | -ণা ধা পা -া I
০ ০ ০ ০ আ কা শে র ০ ০ পূ র্ ণ০ ০০ ০ ০ ০ শ শী ০

I গমা -পধা -ণর্সা র্সা | পণা -ণধা -পা মা | -গা -া -া -া | গা গমা রা গা I
সে০ ০০ ০০ ও কাঁ০ ০০ ০ দে ০ ০ ০ ০ ক লঙ্ ক ছ

I গমা -পধা -ধপা -মগা | -মপা -পমা -গরা -গমা | -মগা -রসা -ন্সা -া |
লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০
| -া -া -া -া II
০ ০ ০ ০

II মা মা ধর্সা -ণধা | -পধা -না -া -ধা | না র্সা নর্সা -া | -া -া -া -া I
সৌ র ভে০ ০০ ০০ ০ ০ ০ গৌ র বে ০ ০ ০ ০ ০

। না র্সা না -া । না না নর্সা -র্র্সা । -নধা ধনা -র্সনা -ধর্সা । -র্সনা -ধা পা -া ।
কে ত ব০ তু ল না০ ০০ ০০ হ০ ০০ ০০ ০ ০ বে০

। ধা ণা ধা -া । মা মা মা -া । পধা -ণর্সা -ণা ধা । পা -া গা মা ।
আ প নি ০ আ প ন ০ স০ ০০ ম্ ভ বে ০ যে মন্

। পা -া র্সর্রা -নর্সা । ণা -ণধা -া -পা । মা গা -া -া — -া গা মা রা ।
গ ঙ্ গা০ ০০ প্ ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ ০ গঙ্ গা জ

। গমা পধা ধপা -মগা । -মপা -পমা -গরা -গমা । -মগা -রসা -ন্সা -া ।
লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

। -া -া -া -া ।। ।।
০ ০ ০ ০

গানটি গীতরত্ন গ্রন্থে নেই ; তবে বহু সংকলন-গ্রন্থে এটি নিধুবাবুর নামে পাওয়া যায়। মতান্তরে এটি শ্রীধর কথকের রচনা বলেও স্বীকৃত হয়। সুপ্রাচীন গায়ক মহলে এটি নিধুবাবুর গান ব'লে পরিচিত।

[৪]

খাম্বাজ। তেতালা

কাজল নয়নে আর দিও না কখন
শরে কেবা নাহি মরে ? বিষযোগ তাহে কেন ?
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিত প্রাণ
বাঁচিবার এক হেতু তাহা আছে শুন,
সুধা হলাহল সুরা—নয়নের তিন গুণ।

১´ ২ ০ ৩
।। গা মা গা -া । -া -া -া -া । গা গা গমা -পমা । -গা -রগা -মপা -া ।
কা জ ল০ ০ ০ ০ ০ ন য় নে০ ০০ ০ ০০ ০০ ০

। মপা -া -া -া । গা পা মা -গা । -া -া -া -া । -া -া গা মা ।
আ ০ ০ র্ দি ও না০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ক খ

। গমা -পধা -ধপা -মগা । -মপা -পমা -গমা -গমা । -মগা -রগা -ন্সা -া ।
ন০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

। -া -া -া -া । ধা ধা ণা ধা । -া -া -া -া —মা পধা -ণর্সা -ণা ।
০ ০ ০ ০ শ রে কে বা ০ ০ ০ ০ না হি০ ০০ ০

। -ধা পা -া -া । গা -মা সর্রা -সা । ণা -ধাঃ -পঃ মগা । -া -া -া -া ।
ম রে ০ ০ বি ০ ষ০ ০ যো ০ ০ গ০ ০ ০ ০ ০

। রা গা -া রা । গমা -পধা -ধপা -মগা । -মপা -পমা -গমা -গমা ।
তা হে ০ কে ন০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

। -মগা -রসা -ন্সা -া । -া -া -া -া ॥
০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

॥ গা মা ধা -া । -া -া ধা ধা । ধণা -র্সণা -ধা -ণা । ধপা ধা -া -া ।
তো মা র ০ ০ ক টা ক্ষে০ ০০ ০ ০ কে০ হ ০ ০

। -া -া না না । না না -া -র্সা । -র্সনা -া -া -ধা । না -া র্সা র্সা ।
০ ০ না বাঁ চি ত ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্রা ০ ০ ণ

। -া -া না র্সা । নর্সা -র্গা -র্মগা -র্সা । না -া -র্সা না । র্সা -া -া -া ।
০ ০ বাঁ চি বা০ ০০ ০০ ০রূ এ ০ কু হে তু ০ ০ ০

। না না না র্সা । -া -া -া -া । নর্সা -র্রা র্রর্সা -ণধা । -ণর্সা -র্সণা -ধা -পা ।
তা হা আ ছে ০ ০ ০ ০ শু০ ০ ন০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

। পা পধা -ণা -ণধপা । -া মপা মগা -মা । -রগা মা পা মা । পা -া -া -া ।
সু ধা০ ০ ০০ ০ হু০ লা০ ০ ০ হ ল সু রা ০ ০ ০

। পা না না র্সা । নর্সা -র্রা র্রর্সা -ণধা । ধণা -র্সা র্সণা -ধপা । -মগা -রগা -া -া ॥ ॥
ন য় নে র তি০ ০ ন০ ০০ গু০ ০ ণ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

গীতরত্ন গ্রন্থে সুর ও তাল : ভৈরব, জলদ তেতালা

যদুভট্টের গান (ধ্রুপদাঙ্গের গান)

রচনা—যদুভট্ট

রাগ—দেশ
তাল—সুরফাকতাল

দেখিয়ে হৃদয়-মন্দিরে, ভজ না শিব সুন্দরে।
কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে কর অযতন, এখন করহ সাধান ॥
এই যে পতিত-পাবন, এই যে জগত-তারণ।
এই সে পরম কারণ, করহ তাঁর মনন ॥
হইবে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম সত্ত্ব,
ভাবিলে না সেই সত্য, নিত্য বিভু নিরঞ্জন।
হৃদয়ের প্রেমহার, দাও হে তাঁরে উপহার,
পেয়েছ কৃপায় যাঁহার দেহ হৃদয়-জীবন ॥

॥ × ২ ৩
পা ধা মা পা | ধা পা | মরা মরা ধা পা |
দে খি য়ে হৃ | দ য় | ম ০ ০ ন দি রে

। না না র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সর্রা ণা ধা পা |
ভ জ ০ না | শি ব | সু ০ ন্ দ রে

। পা ধা মা পা | ধা পা | মা গা রা া |
কি ভ্র মে ভু | লি য়ে | তাঁ ০ রে ০ |

। রা রা া রা | পা মা | গা গরা সা া |
ক র ০ অ | ০ য | ত ০০ ন ০ |

। মা রা মা পা | ধা ধা | র্সণা ভ্র ধা পা | ॥
ত খ ন ক | র হ | সা০ ০ ধ ন |

॥ মা পা না না | না না | র্সা –া র্সা র্সা |
এ ই সে প | তি ত | পা০ ০ ব ন |

। না র্সা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা | র্সর্রা ণা ধা পা |
এ ই সে জ | গ ত্ | তা০ ০ র ণ |

। মা রা মা মা | পা পা | না –া র্সা র্সা |
এ ই সে প | র ম | কা ০ র ণ |

। র্সর্রা র্সা ণা ধা | পা ধা | র্সণা -া ধা পা | ॥
ক০র হ তাঁ | ০ র | ম০ ০ ন ন্ |

। রা রা মগা রা । রা রা । রা -া রা -া ।
ই ই য়ে০ বি । ষ য়ে । ম ০ স্ত ০

। রা গা মা পা । ধা পা । মা মগা রগা সা ।
হা রা লে প । র ম । স ০০ স্ব০ ০

। রা রা মা মা । পা -া । ধা -া র্সণা -া ।
ভা বি লে না সে ই স ০ ত্য০ ০

। ধা ণা ধা পা । পা ধা । মা ধা পা পা ।
নি ০ ত্য বি ভু নি র ন্ জ ন

মা পা না না । র্সা -া । র্সা র্সা -া র্সা ।
হৃ দ য়ে রা । প্রে ০ ম হা ০ র ।

। না র্সা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্সা । র্সর্রা ণা ধা পা ।
দা ও হে তাঁ ০ রে উ০ প হা র

। মা রা মা মা । পা পা । না -া র্সা র্সা ।
পে য়ে ছ কৃ পা য় যাঁ ০ হা র

। র্সর্রা র্সা ণা ধা । পা ধা । র্সণা -া ধা পা
দে০ ০ হ হৃ দ য় জী০ ০ ব ন

খেয়াল অঙ্গের গান

[অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি খেয়ালের প্রতিষ্ঠাতা সদারঙ্গ। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশদশকে খেয়াল অঙ্গের বাংলা গান রচিত হয়। রামমোহন রায়, যদুভট্ট, প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ ব্রহ্মসঙ্গীতের মাধ্যমে এই ধরনের গ ন রচনা করেন]।

রচনা—রামমোহন রায় রাগ—ইমন-কল্যান
তাল—তেওট

ভাব সেই একে। জলেস্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণার পরমন্ মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতিনাং পরমংপরাস্তাৎ, বিদায় দেবং ভুবনেশামীড্যম্।

০ ৩
পাপা সর্সা ধপা | পক্ষা ধপপা ক্ষা গা |
ভা ০ ০০ ০০ ব ০ ০০০ সে ই

। × ২ ০ ৩
পা পা -া | রা গা রা -া | ন্‌রসা -া -া | সাসা -া ধ্‌া সরা
এ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০০০ ০ ০ জলে ০ ০ স্থলে

। রপা গা -া | রা রপপা গা -া | রাররা গপা | ক্ষপধা -া -া পধর্সা
শ্‌ন্যে ০ ০ যে০০ স ০ ০ মান্‌ ভাবে ০০ ০ ০ ০০০

। র্সা না ধা | ক্ষধা পা ক্ষা গক্ষা ॥
থা ০ ০ ০০ কে ০ ০০

-া গগা পক্ষা ধপা |
০ যে০ র চি ০ লে

॥ × ২ ০
র্সা র্সা -া | পধা র্সনা র্সা া | -া সধা র্সা | র্রা -া া র্সর্রাগা |
এ সং ০ ০০ ০০ সা ০ ০ র্‌ আদি অ ন্ত ০ ০ ০০০

। র্গা -া র্রা | নর্রা র্সা র্সর্সা ধা | পধপা -া া | -া পপা পধপা ক্ষগা ।
না ০ ০ হি০ যা ০০ ০ ০০০ ০ ০ র সেন্দ্রা নে০০ ০সা

। গপপা গা -া | রা রপপা গা া | রা নরা গপা | ক্ষপধা -া -া পধর্সা |
ক০০ ল ০ ০ কে০০ হ ০ ০ নাহি জানে ০০০ ০ ০ ০০০

। র্সা না ধা | ক্ষধা পা ক্ষা গক্ষা |
তাঁ ০ ০ ০০ কে ০ ০০

-া সাসা সারা সরগা |
০ ত মী ০০ ০০

। গগা -া গা | -া গরা গা পা | ধর্সা -া ধা | -া পা পধপা -া |
স্বরা ০ পাং ০ পর মং ০ মহে ০ ০ ০ ০ স্বরং ০

। গা গা -া | রা গা রা রপা | গা -া -া -া | রা রগা রা সা |
০ তং ০ ০ দে ০ ব০ তা ০ ০ ০ নাং ০ ০

। -া সধ্‌া সা | রসরা রপা গা রা | সরা সরপা গগা | -া গগা পক্ষা ধপা |
০ পর ম ০০ক দৈ ০ ০ ০০ ০০০ বতং ০ পতিং ০০ ০০

। র্সর্সা -া -া | -া র্সনা র্রর্সা -া | -া র্সধা র্সা | -া র্সর্রা -া র্সর্রর্গা |
পতী ০ ০ ০ ০০ নাং ০ ০ পর মং ০ পর ০ ০ ০ ০

। র্গা -া র্রা | র্সর্রর্সা ধা পপধপা ক্ষগা | গপা গা -া | রা ররা গপা পধর্সা |
রা ০ ০ ০০০ ং বিদা০০ মে দে০ বং ০ ০ ভুব নে০ ০০০

। র্সর্রর্সা -া নধা | ক্ষধা পা ক্ষা গক্ষা ॥
শমী০ ০ ০০ ০০ ড্যং ০ ০০

টপ্পা অঙ্গের গান

রচনা ঃ কালী মির্জা তাল ঃ ঝং ৮ মাত্রা

যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা,
দক্ষিণে কালীকে কৃষ্ণ ভেদ ক'রো না ॥
অসিধারী, বংশীধারী, পিতাম্বর দিগম্বরী
দ্বিভুজ মুরলীধারী লোলরসনা।
বনমালী মুণ্ডমালা, শিখিপুচ্ছ শশিভালা,
মকরাকৃতি কুণ্ডলা, কভু শব শিশু বলি,
দেখ এই কৃষ্ণকালী, অভেদ মান না ॥

॥ -া -া -া -া গ, গমপধনর্সা -া নর্সা -া া ণধা -া |
০ ০ ০ ০ ০ যদি০০০০ ০ ভব ০ ০ নদী ০

মধপণা ধপমগা -া -া গসা -া গা -া মা
পা০০০ ০র্হতে ০ ০ থাকে ০ বা ০ স

। পা -া -া -া -া -া -া মা ধধা -া ধা ধা -া ণা -া |
না ০ ০ ০ ০ ০ ০ দ ক্ষিণে ০ কা লী ০ কে ০

ণধাপধপা -া গগগাগমা ধপামগা, পমাগরা মগারস্নস
০০ ০কৃষ্ণ ০ ভে০ দকো রোনা০০ ০০ ০০ ০০০ ০ ০০

। -া -া -া -া ম প না না -া না র্সণর্সা না -া না না |
০ ০ ০ ০ অসিধা রী ০ বংশীধারী পী ০ তা ম্বর

নার্সানধাপধপা র্সর্সর্সপা প প ধ ণ ধ প ম গা গ গ গ ম মা
দিগ০ ম ব রী দ্বিভু জ ০ মুর লী ০০ ০ ধা রী লোলরসনা

। মগরসন্সা |
০০০০০ ০

। -া -া -া -া -া গ গ গা গ ম ম মা -া ম ম প পা ।
০ ০ ০ ০ ০ বনমালী মুণ্ডমালা ০ শিখি পুচ্ছ

পা, ধণধ, ম গা ম প না -নানা র্সা -া নর্সা ন নানানা ।
শশী০০০ ডালা মকরা কৃতি ৫ ০ কুণ্ ডলা কু ভু শ ব

। নর্সানা, ধপা -া র্সর্গর্গর্গা র্গর্ম, র্রর্মর্গা র্রর্সনা -া -া ।
শিশু০ বলি ০ দেখ এ ই কৃষ্ণ ০০ ০ কা লী ০ ০

ন না, ন র্সা র্সর্রর্স -া ণধা নর্সণধপা ।
অভে দ মানো না০ ০ ০ ০০ ০০ ০০০

। ধাণধা, পমগমা । পধণধপামগারসা ।
০০ ০ ০০ ০০ ০০০০০ ০০ ০০

নিবারণ পণ্ডিতের গণ-সঙ্গীত

একসাথে চল লড়বো মোরা রাঙ্গা দুলিয়া
সবে মিলে থাকবো সেথা বিভেদ ভুলিয়া
বিভেদ ভুলিয়া।

ভাবি সমাজ গড়বো মোরা দুঃখ করবো দূর
হাটে মাঠে রে ভাই আনন্দেরি সুর
আলো করবো আঁধার রাতি
ঘরে ঘরে জ্বালবো বাতি
গাইবো নবগান, দুঃখ করবো অবসান
নূতন সমাজ গড়বে কে রে আয়রে ছুটিয়া
আয়রে ছুটিয়া ॥

শ্রমিক কৃষক সবাই সমান সবার দুঃখ এক
এক অবস্থায় দেশবাসী পড়েছি অনেক
দুঃখ সহিয়াছি ঢের
ভয় ভাবনা কিসের
আয়রে যত কৃষক শ্রমিক উঠরে জাগিয়া
উঠরে জাগিয়া ॥

কোনা সম্মেলনের পূর্বে একমাস ধরে গ্রামাঞ্চলে প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রচার ও সম্মেলনের মঞ্চে গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে গানটি সামান্য পরিবর্তিত হয়, এখানে পরিবর্তিত রূপটি দেওয়া হল।

। প্‌া প্‌া সা । সা সা রা । গা গা ধা । পা পা -া ।
এ ক সা থে চ ল্‌ গ ড়্ বো মো রা ০

॥

। গা -া রা । গা রা -া । গা -রা -সা । -া --া । } ।
রা ং গা দ্‌ নি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

। গা গা -পা । পা পা -া । ধা ধা ধা । পা পা -া ।
স বে ০ মি লে ০ থা ক বো সে থা ০

। গা পা -পা । ধা গা -া । ধা -া -া । -া -া -া ।
বি ভে দ্‌ ভু লি ০ । য়া ০ ০ ০ ০ ০

। গা গা গা । রা রা -া । গা -রা -সা । -া -া -া ।
বি ভে দ্‌ ভু লি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

॥ গা গা পা । পা পা পা । ধা ধা ধা । পা পা -া ।
ভা বি ০ । স মা জ গ ড়্ বো মো রা ০

। ধা ধা র্সা । র্রা র্রা র্গা । র্রা -া -া । -া -া র্সা ।
দ্‌ খ্‌ খ ক র বো দ্‌ ০ ০ ০ ০ র

। পা -া র্সা । র্সা র্সা -া । না না না । ধা পা -া ।
হা ০ টে মা ঠে ০ ত্‌ ল বো রে ভা ই

। গা পা পা । ধা ধণা । । ধা -া -া । -া -া পা ।
আ ন ন দে ০রি ০ স্‌ ০ ০ ০ ০ র্‌

। গা গা পা । পা পা পা । গা গা পা । পা পা -া ।
আ লো ০ ক র বো আঁ ধা র রা তি ০

। -া -া ধা । র্রা র্সা র্সা । না না না । ধা পা -া ।
০ ০ ঘ রে ঘ রে জ্বা ল বো বা তি ০

। গা -া পা । ধা না -া । ধা -া ধা । পপা পা -া ।
গা ই বো ন ব ০ গা ০ ন্‌ দ্‌খ্‌ খ ০

। গা গা গা । রা রা -া । -রসা -া -া । -া -া সা ।
ক র বো অ ব ০ সো ০ ০ । ০ ০ ন্‌

। র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা । না না না । ধা পা -া ।
ন্‌ ত ন স মা জ গ ড়্ বে কে রে ০

। গা -া পা । ধা না -া । ধা -া -া । -া -া -া ।
আ য় রে ছ্‌ টি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

। গা -া গা । রা রা -া । গা -রা -সা । -া -া -া ॥
আ য় রে ছ্‌ টি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

গিরিশচন্দ্র ঘোষের গান

রচনা—গিরিশ ঘোষ
'আগমনী' নাটকের গান

রাগ—সাহানা মিশ্র
তাল—ধৎ (১৪ মাত্রা)

ওমা কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলে
উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে মরে যাই
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই
নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে ব'লব উমা আমার
ঘরে নাই ॥

০ ৩ × ২
। সা ধা ধা | নধা ননা পা পা | মা পা পা | ধমা পপা মজ্ঞা জ্ঞ ।
কে ম ন্ ক০ ০০ রে ০ প রে র্ ঘ০ ০০ রে ০

। জ্ঞমা জ্ঞ মা | রা -া সা রা | মা পা মা | ণধা ণণা পা পা ।
ছি০ লে ০ উ ০ মা ০ ব ল্ মা তা০ ০ই ও মা

। সা মা মা | মা -া মা -া | ধা মা -া | পা পা জ্ঞা -া ।
ক ত ০ লো ০ কে ০ ক ত ০ ব ০ লে ০

। মা ধা ধা | ণধা ণণা পা পা | প র্সা না | র্সা -া র্সা র্সা ।
শু নে ০ ভে০ ০০ বে ০ ম রে ০ যা ০ ০ ই

০ ৩ × ২
। ণা ণা পা | ধা মা পা পা | পা না না | র্সা না র্সা র্সা ।
মা র্ প্রা ণে ০ কি ০ ধৈ র্ য ধ ০ রে ০

। পা র্রা র্রা | মজ্ঞা র্মা র্রা র্সা | না র্সা র্রা | র্সনা র্বসা ণধা নপা ।
জা মা ই না ০ কি ০ ভি ক্ খা ক০ ০০ রে০ ০০

। মা ধা ধা | মা -া জ্ঞা জ্ঞা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা | রা রা সা রা ।
এ বা র্ নি ০ তে ০ এ০ লে০ ০ ব ল্ ব ০

। ণা সা রা | রা -া ণা সা সা মা মা | ধা মপা জ্ঞা জ্ঞ ।
উ মা ০ আ ০ মা র ঘ রে ০ না ০০ ০ ই

গ্রন্থপঞ্জী

সাঙ্গীতিকী — দিলীপ কুমার রায়
রবীন্দ্রনাথের গান -- সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নজরুলের গান — নারায়ণ চৌধুরী
রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা— শুভ গুহঠাকুরতা
বাংলা সঙ্গীতের রূপ— সুকুমার রায়
ভারতীয় সঙ্গীতের কথা প্রভাতকুমার গোস্বামী
প্রতিদ্বন্দ্বী (হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মরণে সম্পাদক গৌতম নন্দী)
নিবারণ পণ্ডিতের গান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
বাংলা গানের বিবর্তন ডঃ উৎপলা গোস্বামী
বাংলা লোক সঙ্গীতের রূপরেখা বুদ্ধদেব রায়
লোক সাঙ্গীতিকী— বুদ্ধদেব রায়
নিধুবাবুর গান— রাজ্যেশ্বর মিত্র